রাজ্য শিক্ষা সংস্থা

পশ্চিমবঙ্গ

রাজ্য শিক্ষা সংস্থা

পশ্চিমবঙ্গ

বাণীপুর ঃ চব্বিশ পরগণা
১৯৮২

বার্ষিক সংকলন
রাজ্য শিক্ষা সংস্থা
বাণীপুর, চব্বিশ পরগণা
ফেব্রুয়ারী, ১৯৮২

ANNUAL NUMBER
STATE INSTITUTE OF EDUCATION
BANIPUR, 24-PARGANAS.
February, 1982

প্রচ্ছদ
শ্রীবিশ্বপতি মাইতি
হুগলী ব্রাঞ্চ গভর্ণমেন্ট হাই স্কুল
হুগলী।

রাজ্য শিক্ষা সংস্থার
অধ্যক্ষ কর্তৃক
বাণীপুর, চব্বিশ পরগণা থেকে প্রকাশিত
এবং
বাগেরহাট প্রিন্টিং ওয়ার্কস
পোস্ট অফিস রোড, হাবড়া, চব্বিশ পরগণা
থেকে মুদ্রিত।

সম্পাদকমণ্ডলী :

সভাপতি
শ্রীকমলকুমার চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক
শ্রীআলোক মাইতি

সহযোগী
শ্রীমতী কৃষ্ণা বসু
শ্রীসুধাংশুশেখর সেনাপতি
শ্রীনিমাইদাস দত্ত

: সূচীপত্র :

মুখবন্ধ

বিগত বছর থেকে পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার একটি নতুন শিক্ষাক্রম প্রবর্তিত হয়েছে। এ রাজ্যের অর্ধ লক্ষাধিক প্রাথমিক বিদ্যায়তনে নতুন শিক্ষাক্রমটি যাতে সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত হতে পারে সেজন্যে রাজ্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছেন।

রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ কর্মরত শিক্ষকদের নয়া শিক্ষাক্রম-অভিমুখীকরণের সুবিশাল কর্মসূচীর সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের উদ্যোগও নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, বিদ্যালয়ের বাস্তব পরিবেশে শিক্ষাক্রম রূপায়ণ করতে গিয়ে শিক্ষক মহাশয়গণ যেসব সমস্যা ও অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন সেগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়ে তার কার্যকরী সমাধানের পথ খুঁজে বের করবার জন্যও অগ্রণী হয়েছেন। শিক্ষাক্রম উন্নয়নের কাজেও এর প্রয়োজন আছে।

রাজ্য শিক্ষা সংস্থা (বর্তমানে নব গঠিত রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের অন্যতম অঙ্গ) দীর্ঘদিন যাবৎ এ রাজ্যের শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের বিবিধ কর্মসূচীর সঙ্গে যুক্ত আছেন। বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকদের জন্য গবেষণামূলক ও বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক বিবিধ ধরণের পত্র-পত্রিকাও তাঁরা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে থাকেন। নতুন প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষক-সভার প্রতিবেদন, শ্রেণীতে আটকে না রাখার নীতির তাৎপর্য, উন্নততর শিক্ষা-পরিবেশ রচনায় গণ-উদ্যোগের সংযুক্তি, বাংলা পঠন-পাঠনের ক্রমায়ণ, বৃহদায়তন শ্রেণীতে পঠন-পাঠন, হাতের লেখা শেখানো, গণিত শিক্ষাদানে মৌল ক্ষমতা বিকাশের উপায়, প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ শিক্ষাক্রমের পুনর্বিন্যাস, প্রাথমিক শিক্ষার রূপান্তর প্রভৃতি বিষয়ে সুপরিকল্পিত ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক রাজ্য শিক্ষা সংস্থার এ ধরনের প্রকাশন প্রয়াসকে আমি সাধুবাদ জানাই।

যাঁদের জন্য এই তথ্য ও চিন্তাঋদ্ধ সংকলন তাঁদের কর্মপ্রয়াসে এটি দিশারীর ভূমিকা নিতে পারবে বলেই আমি আশা করি।

ডঃ সুনীল রায়চৌধুরী
শিক্ষা অধিকর্তা (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক) পশ্চিমবঙ্গ
ও
সদস্য-সচিব,
রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ

কলকাতা
১৯. ২. ১৯৮২

দিশারী

রাজ্য শিক্ষা সংস্থা : স্টেট ইনষ্টিটিউট অব্ এডুকেশন

প্রতিষ্ঠা ও অবস্থান :

ভারতের যে বারটি রাজ্যে সর্বপ্রথম স্টেট্ ইনষ্টিটিউট অব্ এডুকেশন (বাংলা নাম : রাজ্য শিক্ষা সংস্থা) স্থাপিত হয় পশ্চিমবঙ্গ তাদের অন্যতম।

১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের এক অনুপম বসন্তে (এপ্রিল) মহানগর কলকাতা থেকে মাত্র ৪৫ কিঃ মিঃ রেল-দূরত্বে জাতীয় সড়ক থেকে মাত্র ১ কিঃ মিঃ ভিতরে বাণীপুর-এর নগরায়ণমুখী গ্রামীণ মনোরম শিক্ষা-পরিবেশে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিক্ষা সংস্থার সূচনা হয়। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের শিক্ষা-ইতিহাসে এই সালটি আরও বেশী করে স্মরণীয় হয়ে আছে ভারতীয় শিক্ষা-কমিশন গঠনের বছর হিসাবেও।

বাণীপুর চব্বিশ পরগণা জেলায় অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক অনন্যসাধারণ শিক্ষা উপনিবেশ, একমাত্র গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের সঙ্গে যার কিছু সাদৃশ্য আছে। প্রকৃতপক্ষে মহাত্মা গান্ধী ও গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শের মেলবন্ধন ঘটিয়ে স্বাধীনোত্তর ভারতের সূচনাপর্বের সঙ্গে সঙ্গে এবং কিছু পরে পরেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি স্নাতকোত্তর বুনিয়াদী শিক্ষক শিক্ষণ মহা-বিদ্যালয় (পরবর্তীকালে গবেষণা বিভাগ যুক্ত হয়), দুটি নিম্নবুনিয়াদী শিক্ষক শিক্ষণ সংস্থা, একটি স্নাতকোত্তর শারীর শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, পরীক্ষামূলক বিদ্যালয় (পরবর্তীকালে সহশিক্ষামূলক উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত), রাষ্ট্রীয় কল্যাণ ভবন (অনাথ শিশুদের জন্য এ রাজ্যের সর্ববৃহৎ আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান—বর্তমানে তিনটি প্রাথমিক বিভাগ সহ মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে), জনতা মহাবিদ্যালয়, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, শিশুদের জন্য দুটি নার্শারী বিদ্যালয় স্থাপনের দ্বারা বাণীপুরকে শিক্ষা-দিশারীরূপে চিহ্নিত করেন। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষক-শিক্ষার্থীর জন্য আবাসিক এবং অধ্যয়ন উপযোগী শান্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত হওয়ায় বাণীপুর ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সকলের কাছেই গভীর শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে বাণীপুর সন্নিহিত হাবড়া অঞ্চলে আরও একটি করে স্নাতক মহাবিদ্যালয়, স্নাতক বাণিজ্যিক মহাবিদ্যালয়, স্নাতকোত্তর শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, অর্ধশতাধিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শতাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয় বাণীপুরের অবস্থানগত গুরুত্বকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

সুবৃহৎ শ্রেণীকক্ষ, বিজ্ঞানকক্ষ, গ্রন্থাগার সহ রাজ্য শিক্ষা সংস্থা একটি চমৎকার গৃহে অবস্থিত। অধ্যক্ষ, অধ্যাপক মণ্ডলী এবং শিক্ষার্থীদের জন্য আবাসগৃহও রয়েছে।

পরিবেশ অনেকাংশে অনুকূল ছিল – তবু পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিক্ষা সংস্থা দিশারীর ভূমিকা নিয়ে, লক্ষ্যাভিমুখে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে প্রায়শ: শম্বুক গতিতে এগিয়েছে, কখনও বা প্রখর

স্থবিরতায় মুখ থুবড়ে পড়তে পড়তে কোনো রকমে গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে। একটি সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এরকমটি হওয়ার পেছনে যে কার্য-কারণ সম্বন্ধ রয়েছে তার অনুসন্ধানের আগে রাজ্য শিক্ষা সংস্থার লক্ষ্য ও কার্যক্রম কি সে সম্পর্কে মোটামুটি সুস্পষ্ট ধারণা নেওয়া যেতে পারে।

পটভূমিকা ঃ

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে স্বাভাবিক কারণেই শিক্ষার পরিমাণগত বৃদ্ধির দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। দ্রুত শিক্ষা-বিস্তারের লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য সর্বাধিক প্রযত্ন নেওয়া হয়েছিল। বিদ্যালয়-শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের জন্য বেশ কয়েকটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এগুলির মধ্যে সেন্ট্রাল ইনষ্টিটিউট অব্ এডুকেশন (১৯৪৭), সেন্ট্রাল ব্যুরো অব্ টেকসট্ বুক রিসার্চ (১৯৫৪), অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল ফর সেকেণ্ডারী এডুকেশন (১৯৫৫), ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট অব্ বেসিক এডুকেশন (১৯৫৬), ন্যাশন্যাল ফাণ্ডামেন্টাল এডুকেশন সেন্টার (১৯৫৬), ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট অব্ অডিও ভিস্যুয়াল এডুকেশন (১৯৫৬) অন্যতম। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে উল্লিখিত সবগুলি প্রতিষ্ঠানকেই ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অব্ এডুকেশন্যাল রিসার্চ এণ্ড ট্রেনিং (N. C. E. R. T. নামে পরিচিত) নামক আরও বৃহত্তর এক স্বশাসিত সংস্থার অধীনে নিয়ে এসে সামগ্রিকভাবে সারা ভারতের শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

এন. সি. আর. টি. শিক্ষা গবেষণা ও সম্প্রসারণসূচীর জন্য বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান করেন। আঞ্চলিক উপদেষ্টা নিয়োগ করে রাজ্যগুলির শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করা হয়। এ ছাড়া আজমীড়, ভূপাল, ভুবনেশ্বর এবং মহীশূরের চারটি আঞ্চলিক-শিক্ষা মহাবিদ্যালয় (রিজিওন্যাল কলেজ অব্ এডুকেশন)-এর মাধ্যমেও সারা দেশের শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের চেষ্টা করা হয়। বস্তুতঃপক্ষে শিক্ষা-গবেষণা শিক্ষক-প্রশিক্ষণ এবং পাঠ্য পুস্তক রচনা ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে এই কেন্দ্রীয় সংস্থা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় শিক্ষা কমিশন গঠনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সামগ্রিক শিক্ষা পরিকল্পনার এক নতুন যুগের সূচনা হয়। কমিশনের রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকার ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে সতের দফা জাতীয় শিক্ষা-নীতি ঘোষণা করেন—যা এখন পর্যন্ত অনুসৃত হচ্ছে।

ইতিমধ্যে যে দৃষ্টিকোণ থেকে কেন্দ্রীয় স্তরে এন. সি. আর. টি. স্থাপিত হয় সেই একই দৃষ্টিকোণ থেকে রাজ্য স্তরে স্টেট ইনষ্টিটিউট অব্ এডুকেশন (পরবর্তী কালে S. C. E. R. T.) স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গেও রাজ্য শিক্ষা সংস্থা বাণীপুরে স্থাপিত হয়।

মধ্য প্রদেশের সেহোরে ২০-২৪ নভেম্বর, ১৯৬৪ বিভিন্ন রাজ্য শিক্ষা সংস্থা সমূহের প্রথম যে ষাণ্মাসিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তার প্রতিবেদন থেকে এটা স্পষ্ট জানা গেল—সাধারণভাবে বিদ্যালয় শিক্ষার এবং বিশেষভাবে শিক্ষক শিক্ষণের গুণগত মানোন্নয়নের অন্যতম উদ্দেশ্য নিয়ে এই সংস্থাগুলি স্থাপিত হয়েছে। ব্যবহারিক দিকের কথা বিবেচনা করে প্রথমতঃ প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে রাজ্য শিক্ষা সংস্থা সমূহ কাজ শুরু করে কিন্তু এটাও স্থির হয় যখনই যথেষ্ট অভিজ্ঞতা এবং আত্মবিশ্বাস জন্মাবে তখনই সংস্থার কাজ মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রসারিত হবে। বস্তুতঃপক্ষে পরবর্তীকালে অন্যান্য রাজ্যের মত পশ্চিমবঙ্গেও রাজ্য শিক্ষা সংস্থার কর্মধারা মাধ্যমিক স্তরেও সম্প্রসারিত হয়।

ভূমিকা ও কার্যাবলী :

উল্লিখিত ষাণ্মাসিক সম্মেলনের প্রতিবেদনে এবং পরবর্তীকালে শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনে রাজ্য শিক্ষা সংস্থা সমূহের যে ভূমিকা ও কাজের কথা উল্লেখ করা হয় (শিক্ষা কমিশন পৃঃ ৪৭৩) তা হল :—

(ক) এটা এখন বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত যে শিক্ষা বিভাগের (প্রশাসনিক) একটা শিক্ষা-শাখা (academic wing) থাকার প্রয়োজন এবং যেখানে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ থাকবেন, যাঁরা বিদ্যালয়ের প্রধান বা সহ শিক্ষকদের বা বিদ্যালয় পরিদর্শকদের প্রয়োজন মত পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করতে পারবেন। সুতরাং রাজ্য শিক্ষা সংস্থা প্রকৃতপক্ষে "a part of the Directorate and forms the principal academic wing of the Department."

(খ) বিভিন্ন রাজ্য স্তরে শরীর শিক্ষা, অডিও ভিস্যুয়াল সেল, ভোকেশনাল গাইডেন্স ব্যুরো, ইভ্যালুয়েশন সেল প্রভৃতি থাকলেও সেগুলি আকৃতিগতদিক থেকে ক্ষুদ্রকায়, অবস্থানগত দিক থেকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকায় সংহতির অভাবে কাজের পরিবর্তে প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। সুতরাং রাজ্যের ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় সংস্থা এন. সি. আর. টি.-র অনুরূপ একটি মাত্র রাজ্য শিক্ষা সংস্থা থাকলে রাজ্যের শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের সুবিধা হবে।

(গ) রাজ্য শিক্ষা সংস্থার উল্লিখিত ভূমিকার কথা মনে রেখেই কমিশন রাজ্য শিক্ষা সংস্থার জন্য নিম্নলিখিত রূপ কার্যক্রম সুপারিশ করেছেন—

(১) বিভাগীয় শিক্ষা কর্মীদের কর্মকালীন শিক্ষা
(২) শিক্ষক-শিক্ষার উন্নয়ন
(৩) শিক্ষাক্রম, পাঠ্যবই, নির্দেশনা এবং মূল্যায়ন
(৪) গবেষণা এবং কাজের মূল্যায়ন
(৫) প্রকাশনা।

লক্ষ্যাভিমুখে : প্রতিবন্ধকতা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিক্ষা সংস্থা ষোল পেরিয়ে সদ্য যৌবনে পদার্পণ করেছে—যদিও যৌবনের প্রাচুর্যে সে অভিষিক্ত নয়। প্রশাসনিক এবং পরিচালনগত যে অনন্যসাধারণ প্রতিবন্ধকতা জন্ম থেকে এই নব জাতকের সঙ্গী ছিল আজও তা সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়নি।

এ রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে সম্ভাবনাময় সংস্থা রাজ্য শিক্ষা সংস্থার যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবার কথা সেজন্যে যে ধরণের বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মণ্ডলী-কর্মীদল প্রয়োজন ছিল—সংখ্যা ও গুণগত দিক থেকে—তা থেকে এই প্রতিষ্ঠান বরাবরই বঞ্চিত।

অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, দুজন অ্যাসিসট্যান্ট প্রফেসর, পাঁচজন লেকচারার এবং একজন স্ট্যাটিসটি-শিয়ান এই প্রতিষ্ঠানের সুরুতে অনুমোদিত পদ হলেও কোন দিনই এই সকল পদের সবগুলি একই সঙ্গে পূর্ণ ছিল না। পরবর্তীকালে কোনো নতুন পদ সৃষ্টি তো হয়নি বরং দুজন অধ্যাপক ব্যতীত কোন অধ্যাপকই এক নাগাড়ে পাঁচ বছরও রাজ্য শিক্ষা সংস্থাতে ছিলেন না।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিক্ষা সংস্থার অধ্যক্ষ ভাগ্য তো প্রায় প্রবাদে পরিণত হয়েছে বলা চলে। প্রথম নয় বছরে পাঁচজন অধ্যক্ষ পদে যোগদান করে—হয় অবসর নিয়েছেন নতুবা বদলী হয়ে অন্যত্র গেছেন। এঁদের অধিকাংশই ছিলেন পরিদর্শন বিভাগ থেকে আগত। আর সবচেয়ে যেটি উল্লেখযোগ্য তা হল গত ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস থেকে অদ্যাবধি পনের বছর হল এই প্রতিষ্ঠানের কোনো অধ্যক্ষ লাভের সৌভাগ্য হয়নি। ভারপ্রাপ্ত উপাধ্যক্ষ দিয়ে কাজ চালানোর ব্যবস্থা করে রাজ্য শিক্ষা সংস্থা-তরণীকে স্রোতের তৃণের মত ভেসে যেতে দেওয়া হয়েছে।

ফল যা হবার তাই হয়েছে। অন্যান্য একাধিক রাজ্যের রাজ্যশিক্ষা সংস্থা সুযোগ্য কর্ণধার, শতাধিক বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মণ্ডলী ও কর্মীদলের সহযোগিতায় যেখানে তর তর করে সমুখপানে এগিয়ে চলেছে, সোনার ফসলে তরণীপূর্ণ করে তুলছেন সে ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিক্ষা সংস্থার কেবলই অস্তিত্বের লড়াই।

দেখাই যাচ্ছে, জোরকদমে লক্ষ্যাভিমুখী হবার পথে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিক্ষা সংস্থার পক্ষে আদৌ সম্ভব ছিল না—সম্ভব করে তোলার জন্য দূরদৃষ্টি সম্পন্ন কোনো পদক্ষেপই নেওয়া হয়নি।

কেবল কর্মীস্বল্পতাই নয়—সংস্থার কর্ণধার এবং মাঝিমাল্লাদের কলকাতা-কেন্দ্রিক মানসিকতাও এই সংস্থার সচ্ছন্দ গতির অন্তরায় হয়েছে। রাজ্য শিক্ষা সংস্থা গ্রামীণ মনোরম শিক্ষা পরিবেশে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও স্থানীয় সহযোগী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অবস্থানগত সুবিধা সত্ত্বেও, প্রধান প্রশাসনিক কেন্দ্র

কলকাতা থেকে মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে সড়ক ও রেলপথে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও প্রায়ই এই সংস্থাকে কলকাতা নিয়ে যাবার বিবিধ প্রচেষ্টা হয়েছে। বলা বাহুল্যমাত্র, এই দোলাচলচিত্ততা সংস্থার সুষ্ঠু কাজকর্মের বাতাবরণ সৃষ্টির পরিপন্থী হয়েছে।

লক্ষ্যাভিমুখে : সার্থকতা

প্রতিবন্ধকতা ছিল এবং আছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিক্ষা সংস্থার সাফল্যের ভাণ্ডার শূন্য—এরকম কথা অতিবড় নিন্দুকেও বলতে পারবে না।

সীমিত সামর্থ্য নিয়ে—পর্বতপ্রমাণ বাধার মধ্যেও যে আন্তরিকতা ও আত্মপ্রত্যয়ের সাহায্যে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করা সম্ভব, সূচনা থেকে গত দেড় দশকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিক্ষা সংস্থার কাজের পরিধি ও গতিপ্রকৃতি, পরিমাণ ও মান বিশ্লেষণ করলে স্বতঃই তা স্পষ্ট হবে।

শিক্ষা কমিশনের নির্দেশ মতো, জাতীয় শিক্ষা গবেষণা প্রশিক্ষণ সংস্থার সহযোগিতায়, সংস্থার উপদেষ্টা সমিতি দ্বারা অনুমোদিত—এ রাজ্যের প্রাথমিক এবং পরবর্তীকালে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও রাজ্য শিক্ষা সংস্থা নানা ধরণের প্রশিক্ষণ, সেমিনার, অনুসন্ধান-পর্যালোচনা-গবেষণা, সম্প্রসারণ ও প্রকাশনার কাজে ব্যাপৃত ছিল এবং আছে।

এক : কর্মকালীন প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ প্রভৃতি (IN-SERVICE TRAINING) :

(ক) প্রাথমিক (বুনিয়াদীসহ) বিদ্যালয়ের প্রধান/সহ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ প্রধানতঃ নিম্নলিখিত বিষয় অবলম্বনে হয়েছে—

বিদ্যালয় সংগঠন ; শিক্ষাক্রম পরিকল্পনা ;
শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ প্রস্তুত ; কর্ম অভিজ্ঞতা ;
সহ পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী ; আদর্শ প্রশ্নপত্র রচনা ;
বিভিন্ন বিষয়—গণিত, ভাষা, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি পড়ানোর উন্নততর কলাকৌশল।

(খ) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ প্রভৃতিতে নিম্নলিখিত দিকগুলি অন্তর্ভুক্ত হত—

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নতুন শিক্ষাক্রম ;
বিভিন্ন বিষয় পঠনে নতুন ধারা বা পন্থা ;
শিক্ষা ও উদ্ভাবনা (Innovation) ; কর্মশিক্ষা ;
অ্যাকশন রিসার্চ ; প্রোগ্রামড্ লার্নিং ;
মূল্যায়ন ও উদ্দেশ্যসাধক প্রশ্নপত্র রচনা।

(গ) প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য সেমিনারগুলিতে প্রধানতঃ—

বিদ্যালয় সংগঠন ; প্রতিষ্ঠানের জন্য নিজস্ব শিক্ষাক্রম পরিকল্পনা ;

মূল্যায়ন ; বিদ্যালয়ে গবেষণা ও উদ্ভাবনামূলক কাজ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচিত হয়েছে।

(ঘ) নিম্নবুনিয়াদী শিক্ষক শিক্ষণ সংস্থার অধ্যক্ষ, অধ্যাপক/অধ্যাপিকাদের স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণগুলিতে প্রধানতঃ—

বিদ্যালয় শিক্ষকদের কর্মকালীন প্রশিক্ষণের কার্যসূচী ; শিক্ষণ সংস্থার শিক্ষাক্রম সংগঠন ; আদর্শ পাঠদানসূচী ও মূল্যায়ন প্রভৃতি প্রসঙ্গে আলোচনা হয়েছে।

(ঙ) বিদ্যালয় পরিদর্শকদের জন্য সেমিনার, আলোচনাসভাগুলিতে প্রধানতঃ উন্নততর বিদ্যালয় পরিদর্শন কৌশল ; সামাজিক মনস্তত্ত্ব ও পরিদর্শন ; জনসংযোগ ও বিদ্যালয় পরিদর্শন ; বিদ্যালয়ের বিবিধ শিক্ষাধর্মী সমস্যা ও তার সমাধান প্রভৃতি বিষয়ে অনুষ্ঠিত হত।

উল্লিখিত প্রশিক্ষণ, সেমিনার ওয়ার্কশপ প্রভৃতি প্রায় প্রতি মাসেই রাজ্য শিক্ষা সংস্থার কার্যালয় বাণীপুরে সাত থেকে দশ বা পনের দিনের জন্য অনুষ্ঠিত হয়েছে। শিক্ষকগণ সংস্থার শিক্ষক-নিবাসে থাকতেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব জেলার শিক্ষকগণই এগুলিতে যোগ দিয়েছেন।

(চ) জেলা পর্যায়ের প্রশিক্ষণ শিবির :

পশ্চিমবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলার স্থানীয় বিশিষ্ট বিদ্যালয়ে এই প্রশিক্ষণ শিবিরগুলি অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজ্য শিক্ষা সংস্থার শিক্ষকগণ ঐ সকল বিদ্যালয়ে যেতেন এবং স্থানীয় শিক্ষক শিক্ষিকাদের সঙ্গে উল্লিখিত বিষয়ে আলোচনা ও মতামত বিনিময় করতেন। এই ধরণের শিবিরগুলি তিন থেকে ছয় দিনের জন্য প্রাথমিক/মাধ্যমিক শিক্ষকদের জন্য অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই জাতীয় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রয়োজনীয়তা এবং জনপ্রিয়তার দিক থেকে খুবই কার্যকরী হয়েছিল।

(ছ) রীতিনিরপেক্ষ বিদ্যালয় শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ (Non-formal) :

রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের সহযোগিতায় এ ধরণের বেশ কয়েকটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম রাজ্য শিক্ষা সংস্থা সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করেছেন। এগুলির পনের থেকে একমাসের জন্য আবাসিকভাবে অনুষ্ঠিত হত।

(জ) পপুলেশন এডুকেশন :

বর্তমানে বিশেষ গুরুত্বপ্রাপ্ত এই বিষয়েও একটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম রাজ্য শিক্ষা সংস্থায় অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(ঝ) শিক্ষামূলক আলোচনা, সভা, চিত্র সহযোগে ভাষণ প্রভৃতি :

ব্রিটিশ কাউন্সিল এবং অন্যান্য বহু সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় এই জাতীয় কার্যক্রম প্রায়ই

রাজ্য শিক্ষা সংস্থার পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে। এগুলিতে দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্গণ উপস্থিত থাকতেন।

দুই : সম্প্রসারণ সূচী (EXTENTION) :

(ক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যবেক্ষণ পরিদর্শন :

রাজ্য শিক্ষা সংস্থার শিক্ষকগণ প্রায়ই প্রাথমিক/মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং নিম্নবুনিয়াদী শিক্ষণ সংস্থাগুলিতে গিয়ে প্রতিষ্ঠানের অসুবিধা ও সমস্যাদি প্রসঙ্গে অবহিত হতেন, তথ্য সংগ্রহ করতেন, সমাধানের দিক নির্দেশে সহায়তা ও মূল্যায়ন এবং শিক্ষাক্রম সংগঠন প্রসঙ্গে পরামর্শাদি দিয়েছেন। রাজ্য শিক্ষা সংস্থায় এসে যে সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ বিভিন্ন বিষয়ে কর্মকালীন প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজ নিজ বিদ্যালয়ে তদনুসারে কর্ম পরিচালনা করতেন বিশেষভাবে সেগুলিতেও অনুসরণীমূলক (followup programme) কাজের জন্য সংস্থার শিক্ষকগণ যেতেন। এতে বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ বিশেষভাবে উৎসাহিত এবং অনুপ্রাণিত হতেন। নিম্নবুনিয়াদী শিক্ষণ সংস্থাগুলির সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষার দ্বারা রাজ্য শিক্ষা সংস্থা সামগ্রিকভাবে প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত সমস্যাবলী সম্পর্কে অধিকতর বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে পারতেন।

(খ) স্কুল কম্‌প্লেক্স (School Complex) :

সহযোগিতায় ইচ্ছুক কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সংগঠিত করে রাজ্য শিক্ষা সংস্থা একাধিক স্কুল কম্‌প্লেক্স স্থাপন করেছিলেন। এগুলির মধ্যে চব্বিশ পরগণার অশোকনগর, চারঘাট এবং বর্ধমান জেলার বিদ্যানগরে বেশ কিছুটা সাফল্যও অর্জিত হয়। এই সকল স্কুল কম্‌প্লেক্সে (১) সহজভাবে শিক্ষা-উপকরণ প্রস্তুত ও ব্যবহার, (২) বিদ্যালয়ের জন্য বার্ষিক শিক্ষাক্রম পরিকল্পনা, (৩) উদ্দেশ্যসাধক প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণ, (৪) পুস্তক ভাণ্ডার গঠন, (৫) স্থানীয় অঞ্চল পর্যবেক্ষণ বা শিক্ষামূলক ভ্রমণ, (৬) শিক্ষক-অভিভাবক সংঘ গঠন প্রভৃতি ব্যাপারে উৎসাহজনক কাজ করা হয়।

তিন : গবেষণা, পর্যালোচনা, অনুসন্ধান (RESEARCH, STUDY & INVESTIGATION) :

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিক্ষা সংস্থা সীমিত সামর্থ্য ও নানারকম অসুবিধার মধ্যেও এ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য শিক্ষা গবেষণাধর্মী পর্যালোচনা ও অনুসন্ধান কার্যক্রম হাতে নিয়েছেন এবং সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত করেছেন। এই সব কার্যক্রমের ফলাফল প্রাথমিক, মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং নিম্নবুনিয়াদী শিক্ষণ সংস্থাসমূহের কাজে খুবই সহায়ক। প্রায় সবগুলিই পরবর্তীকালে পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়েছে। এ পর্যন্ত সমাপ্ত গবেষণা-অনুসন্ধানমূলক কার্যক্রমের কয়েকটি হল—

(১) Socio-Psychic factors in broken-home Children.

(২) Difference of Social attitudes of Basic and Non-Basic Schools —a socio-metric study.
(৩) Investigation into the problem of wastage and stagnation.
(৪) Pilot study on Psycho-Social Aspects of Dropouts and unschooled children of Age-Group 6—11.
(৫) Case study of Elementary training Institutions.
(৬) Testing Basic Skills in Arithmetic of the Primary Children.
(৭) Constraction of Evaluation Tools for use in schools and Teacher-training Institutes.
(৮) Experiments with a Teaching-Learning Model—An Assisted Self Study Method in class-room teaching.
(৯) A Study on Work-Education Prospects in Habra Area.
(১০) A study of Retentive Powers of schools.
(১১) Preparation of Objective-Based Model Questions on History for Class—V.
(১২) Preparation of Objective-Based Model Questions on Bengali for Class—V.
(১৩) A study on the Language Learning Abilities in Primary Children.
(১৪) Study on the Spelling mistakes in Bengali.
(১৫) A Study on the Improvement of English Vocabulary in Primary Children.
(১৬) A Study on Regeonal Language.

চার : প্রকাশনা (PUBLICATION) :

রাজ্য শিক্ষা সংস্থা প্রথম থেকেই বিভিন্ন ধরণের প্রতিবেদন, শিক্ষকদের জন্য সহায়ক পুস্তিকা, বুলেটিন, পত্রিকা প্রভৃতি প্রকাশে উদ্যোগ নিয়েছেন। এগুলি প্রকাশনার সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন বিদ্যালয়, শিক্ষণ সংস্থা, শিক্ষাবিদ্‌গণের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে। এ যাবৎ প্রকাশিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা হল—

(১) বাংলা পঠন ও লিখন

(২) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইতিহাস পঠন-পাঠন
(৩) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শেখানো কেন ও কিভাবে
(৪) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গণিত শিক্ষাদান
(৫) প্রকৃতি বিজ্ঞান শিক্ষাদান
(৬) আরও ভাল শিক্ষক হতে হলে
(৭) ছোটদের কবিতা
(৮) প্রাথমিক শিক্ষায় অপচয়
(৯) প্রাথমিক শিক্ষায় কর্ম-অভিজ্ঞতার সংযোগ কেন ও কিভাবে
(১০) কর্মশিক্ষা কি, কেন, কিভাবে
(১১) পরিকল্পিত শিখন— ইহা কেন এবং কি
(১২) সংখ্যা জ্ঞান
(১৩) সংগীত শিক্ষাদান
(১৪) Test of Basic skills in Arithmatic (with manual)
(১৫) Teacher Made Informal Tests.
(১৬) Cumulative Record.
(১৭) A Booklet on Problems of Child Delinquency.
(১৮) Basic Spelling List (English)
(১৯) প্রশ্ন মঞ্জুষা : বাংলা
(২০) প্রশ্ন মঞ্জুষা : ইতিহাস
(২১) শব্দসম্ভার : মহিষাদল

পরিবর্তিত পরিস্থিতি :

অন্যান্য রাজ্যে ইতিমধ্যেই এন. সি. ই. আর. টি-এর আদলে এস. সি. ই. আর. টি. স্থাপিত হলেও বিবিধ কারণে পশ্চিমবঙ্গে এ কাজ বিলম্বিত হয়েছে। গত ১৯৮০, ২১শে মে-র $\frac{\text{712—Edn (CS)}}{\text{8T—D/127/76}}$ সংখ্যক সরকারী নির্দেশনামায় রাজ্য শিক্ষা সংস্থা এবং অপর ছ'টি সংস্থা— সংগঠন-এর সমন্বয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিক্ষা গবেষণা প্রশিক্ষণ পরিষদ (S. C. E. R. T.) গঠনের কথা ঘোষিত হয়েছে। ইতিপূর্বে রাজ্য শিক্ষা সংস্থার এ রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে যে ভূমিকা ও কার্যাবলী ছিল নতুন পরিস্থিতিতে তার সবই রাজ্য শিক্ষা গবেষণা প্রশিক্ষণ সংস্থাকে বর্তেছে। পরিবর্তিত অবস্থায় এই নব গঠিত সংস্থার অন্যতম অংশীদাররূপে রাজ্য শিক্ষা সংস্থার উপরে শিক্ষাক্রম উন্নয়ন, পাঠ্যপুস্তক গবেষণা এবং প্রকাশনার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে।

এস. সি. ই. আর. টি-এর নিজস্ব কার্যালয় গৃহ বা পৃথক কোনো কর্মীদল না থাকায় আপাততঃ কলকাতাস্থিত ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজে রাজ্য শিক্ষা সংস্থার কর্মীদের নিয়ে প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালিত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষা অধিকর্তা মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে রাজ্য শিক্ষা সংস্থার তুজন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর এবং একজন কার্যালয়-সহকারীর সহযোগিতায় এস. সি. ই. আর. টি-এর অন্যান্য কার্য পরিচালিত হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিক্ষা সংস্থার উপর নতুন দায়িত্ব অর্পিত হলেও শিক্ষক-স্বল্পতার জন্য কার্য পরিচালনার খুবই অসুবিধা দেখা দেয়। বেশ কিছুকাল বাণীপুরস্থিত কার্যালয়ে মাত্র একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর এবং চারজন রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্টকে সংস্থার যাবতীয় কাজ চালাতে হয়।

যা হোক, বিলম্বে হলেও রাজ্য শিক্ষা সংস্থার দায়িত্ব এ বছরের (১৯৮১) ফেব্রুয়ারী মাস থেকে এজজন নবাগত উপাধ্যক্ষের উপর বর্তায়।

রাজ্য শিক্ষা সংস্থার ভারপ্রাপ্ত উপাধ্যক্ষ এই সংস্থায় নবাগত হলেও শিক্ষা—বিশেষত: শিক্ষক শিক্ষণের ক্ষেত্রে তাঁর দীর্ঘদিনের সুবিশাল প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতাও আচাযরূপে তাঁর আশাবাদী আত্মপ্রতায় নিয়ে, সংস্থার নতুন দায়িত্ব ও কর্মধারা সম্পর্কে সচেতনভাবে অবহিত হয়ে প্রতিষ্ঠানটিকে পুনরায় প্রাণময় এবং লক্ষ্যাভিমুখে কর্মমুখর করতে ব্রতী হয়েছেন।

রাজ্য শিক্ষা সংস্থার উপদেষ্টা সমিতির গত ২৭শে জুলাই-এর সভায় সংস্থার বর্তমান কাজকর্মের লক্ষ্য সম্পর্কে দিক্ নির্দেশ করে বলা হয়েছে—

বর্তমানে রাজ্য শিক্ষা সংস্থার যাবতীয় কার্যাবলীর কেন্দ্রবিন্দু হবে গবেষণা এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের নতুন প্রাথমিক শিক্ষাক্রম সার্থকভাবে রূপায়িত করবার পরিস্থিতি পর্যালোচনা এবং সহায়তা করা।

উদ্দেশ্য :

(১) বর্তমানে যে পরিস্থিতিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি কাজকর্ম করছে তা এবং শিক্ষাক্রমের যে সকল দিক কার্যকরভাবে পঠন-পাঠন বা মূল্যায়ন হয় না সেগুলির সমস্যা পর্যালোচনা করা।

(২) নতুন প্রাথমিক শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক, সহায়ক পুস্তক প্রভৃতি বিশ্লেষণ করা—যাতে আরও কার্যকরীভাবে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানের কাজে ঐগুলি সহায়ক হয়।

(৩) পাঠ্যবই, সহায়ক পুস্তিকা এবং শিক্ষামূলক পত্রপত্রিকা প্রকাশ।

(৪) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নতুন শিক্ষাক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নবুনিয়াদী শিক্ষণ সংস্থার কাঠামো-সিলেবাস সংগঠন ও পুনর্বিন্যাস।

কার্যক্রম ঃ

(১) শিক্ষার্থীর আচরণগত উদ্দেশ্য নির্ধারণ ঃ

শিক্ষাক্রমে যে সকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উল্লেখ আছে সেগুলির শিখন ফলশ্রুতি (Learning out comes) স্বরূপ শিক্ষার্থীর মধ্যে কিছু সুনির্দিষ্ট কাম্য আচরণগত পরিবর্তন আসবে।

শিখন ফলশ্রুতি নির্ধারণের আগে তাই উদ্দেশ্যগুলির সুস্পষ্ট বিভাজন প্রয়োজন। বস্তুতঃপক্ষে নিছক উদ্দেশ্য জানা থাকলেই শিক্ষকের পক্ষে প্রয়োজনীয় শিখন অভিজ্ঞতার পরিবেশ রচনা, উপযুক্ত শিক্ষা পদ্ধতি অবলম্বন এবং পরিশেষে যথাযথ মূল্যায়ন পদ্ধতি অবলম্বন করা সম্ভব নয়। এজন্য প্রতিটি বিষয়ের প্রতিটি উদ্দেশ্যের দ্বারা শিক্ষার্থীর মধ্যে যে কাম্য আচরণগত পরিবর্তন আশা করা হচ্ছে সেগুলি যথাযথ শিখন কৌশল অবলম্বনের আগেই জানা থাকা দরকার।

এ রাজ্যের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে তাই পাঠ্যসূচী সম্বলিত একটি শিক্ষাক্রম তুলে দিলেই হবে না—তাঁরা যাতে যথাযথ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ রচনা করতে পারেন সেজন্য শিক্ষার্থীর কাম্য আচরণগত উদ্দেশ্যগুলিও তাঁকে জানাতে হবে। এ কাজে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির প্রয়োজন এবং যথেষ্ট সময় ও শ্রমসাধ্যও বটে। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কার্যসূচীর অন্যতম অঙ্গ হিসাবে রাজ্য শিক্ষা সংস্থা এ কাজটি হাতে নিয়েছেন।

(২) পাঠ্য বই ও সহায়ক পুস্তক বিশ্লেষণ ঃ

এ কাজটিও প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উন্নয়নের অংশরূপেই রাজ্য শিক্ষা সংস্থা সম্পাদন করতে চাইছেন। পাঠ্যবই—শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের কাছেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পাঠ্যবই—শিক্ষার্থীকে কৌতূহলী করে তোলে, শিখনে আগ্রহী করে, শৃঙ্খলাবদ্ধ জ্ঞান পেতে সাহায্য করে—শিখনে আত্মপ্রত্যয়ও এনে দেয়। পাঠ্যবই বিশেষজ্ঞরাই লিখে থাকেন। প্রতিটি পাঠের মধ্যে দিয়েই কিছু না কিছু শেখানো হয় বা ছাত্রের কাছে তুলে ধরা হয়। এসব বিষয়বস্তু কিভাবে নির্বাচিত হল? নির্বাচনের নীতিই বা কি? এমন তো নয়—কেউ কিছু শেখাতে চান বলেই পাঠ্যপুস্তকে তা স্থান পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাক্রমের মূল উদ্দেশ্য, বিষয়ের উদ্দেশ্য, শিক্ষার্থীর আচরণগত উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতেই বিষয়বস্তু নির্বাচন ও বিন্যস্ত হয়ে থাকে। এর অর্থ হল—একবার যদি শিক্ষার্থীর শিখন ফলশ্রুতি, আচরণগত কাম্য পরিবর্তন কি হবে তা সুনির্দিষ্ট করা করা যায় তাহলে তদনুসারে পাঠ্যবইতে বিষয়বস্তুর সমাবেশ ও বিন্যাস করাও সম্ভব। সুতরাং পাঠ্যবই লেখার মূল ভিত্তিভূমি হল শিক্ষার্থীর শিখন ফলশ্রুতি বা আচরণগত উদ্দেশ্য। এবং এভাবে বই লিখিত হলে পাঠ্যবই প্রসঙ্গে প্রায়ই যে সমালোচনা করা হয়—সহজ, কঠিন বা অপ্রাসঙ্গিক তার অবকাশ বিশেষ থাকবে না।

সুতরাং শিক্ষাক্রম উন্নয়নের অঙ্গরূপে পাঠ্যবই (এবং সহায়ক পুস্তক)-গুলি বিশ্লেষণ করে দেখা রাজ্য শিক্ষা সংস্থার অন্যতম দায়-দায়িত্বও বটে। সম্প্রতি প্রকাশিত প্রথম শ্রেণীর মাতৃভাষা বাংলা এবং

গণিত পুস্তক দুটি এধরণের বিবেচনা থেকেই বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখার সিদ্ধান্ত হয়, যাতে করে ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় সংযোজন বা পুনর্বিন্যাস করা সম্ভব হয়।

(৩) নিম্নবুনিয়াদী শিক্ষণ সংস্থার শিক্ষাক্রম সংগঠন :

বর্তমানে চালু শিক্ষাক্রমটিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নতুন শিক্ষাক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাভাবিক কারণেই পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন। প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ভাবী শিক্ষকদের প্রয়োজনের কথা স্মরণে রেখেই একাজ যথাযথ গুরুত্ব এবং দ্রুততার সঙ্গেই যে করা দরকার, এ বিষয়ে রাজ্য শিক্ষা সংস্থা সম্পূর্ণ সচেতন।

(৪) প্রাথমিক বিদ্যালয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ :

নতুন শিক্ষাক্রম যাতে যথাযথভাবে বিদ্যালয়ে অনুসৃত হতে পারে, সেজন্যে বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে কোন্ পরিবেশে কিভাবে কতটুকু পঠন-পাঠন হয়ে থাকে, সে সম্পর্কে যাবতীয় তথ্যাদি জানা একান্ত আবশ্যক। বিদ্যালয়গুলির বাস্তব অবস্থার সঙ্গে তাল রেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের দ্বারাই শিক্ষাক্রম প্রয়োগের ব্যবস্থা করা সম্ভব। এই উদ্দেশ্যে রাজ্য শিক্ষা সংস্থা কর্তৃক বাণীপুর-হাবড়া-অশোকনগর অঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের পরিবেশ সমস্যা অসুবিধা ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করা হচ্ছে।

(৫) শিক্ষক-সভা, সেমিনার, আলোচনাচক্র :

শিক্ষাক্রম রূপায়ণের প্রাথমিক ও প্রধান দায়িত্বই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকার। যত বেশীবার এবং যত ভালভাবে শিক্ষাক্রম সম্পর্কে তাঁদের অবহিত করা যায় ততই ভাল। আবার শিক্ষাক্রম রূপায়ণে শিক্ষকদের সামর্থ্য-সুবিধা-অসুবিধাগুলি সম্পর্কে জানা থাকলেও প্রয়োজনীয় কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব। শুধু তাই নয়, কি জাতীয় সহায়ক পুস্তক-পুস্তিকা বা উপকরণ পেলে শ্রেণীতে পঠন-পাঠনের সুবিধা হয়—তাও শিক্ষক-সম্মেলনের আলোচনা থেকে জানা সম্ভব। বস্তুতঃপক্ষে শিক্ষাক্রম রূপায়ণের জন্য শিক্ষকদের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষার জন্য, পারস্পরিক মত বিনিময়ের দ্বারা কার্যকরী পন্থা নির্ধারণের জন্য রাজ্য শিক্ষা সংস্থা স্থানীয় প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য নানারূপ সেমিনার, সম্মেলন প্রভৃতির ব্যবস্থা রেখেছেন।

(৬) বিদ্যালয় উন্নয়ন এবং শিক্ষাক্রম রূপায়ণে জনসংযোগ ও জন-সহযোগিতা :

যে কোনো উন্নয়নমূলক কর্মসূচী সমাজের সহযোগিতা ব্যতীত কার্যকরীভাবে রূপায়িত করা আমদের মতো উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে একক সরকারী প্রয়াসে আদৌ সম্ভব নয়। বিশেষতঃ শিক্ষার মতো সুবিশাল ব্যাপার তো নয়ই। আমাদের দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির ঘরবাড়ী এবং অন্যান্য সহায় সম্পদ সুষ্ঠুভাবে শিক্ষাক্রম রূপায়ণের পক্ষে রীতিমত সমস্যাপূর্ণ। আবার জনগণের একাংশের শিক্ষা-সচেতনতা এমন একটি স্তরে আবদ্ধ যা বিদ্যালয়ে কিছু কিছু কার্যক্রম অনুসরণের পক্ষে অন্তরায়।

এরকম পরিস্থিতিতে অতি আগ্রহী এবং উৎসাহী শিক্ষক-ও শিক্ষাক্রম রূপায়ণে ক্রমশঃ বীতরাগ হন। এ ধরণের পরিস্থিতি এড়াবার জন্য, সার্বজনীন শিক্ষার দ্রুত প্রসারের জন্য, শিক্ষাক্রম রূপায়ণে শিক্ষকদের উৎসাহী করে তোলার জন্য, বিদ্যালয় যে সমাজের মধ্যেই—সমাজেরই ক্ষুদ্রকায় প্রতিচ্ছবি, সর্বোপরি এক সামগ্রিক শিক্ষা পরিবেশ রচনার স্বার্থে রাজ্য শিক্ষা সংস্থা স্থানীয় শিক্ষাবিদ্, প্রশাসনিক আধিকারিক, পঞ্চায়েত সমিতি ও তার সদস্য, বিধানসভার জনপ্রতিনিধি প্রভৃতির সঙ্গে আলোচনা সভায় ব্যবস্থা রেখেছেন। সকলের সম্মিলিত প্রয়াসেই প্রাথমিক শিক্ষার সুবিশাল কাজ সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে—এ উদ্দেশ্যেই সংস্থা মাঝে-মাঝেই এ ধরণের আলোচনা সভার ব্যবস্থা করবেন।

(৭) সহযোগী বিদ্যালয় প্রকল্প :

সন্নিহিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি পরস্পর সহযোগিতা করে সম্মিলিত কার্যক্রম গ্রহণ করলে সহযোগী বিদ্যালয়সমূহের বিবিধ সমস্যার সমাধান যেমন সহজতর হয় তেমনি বিদ্যালয়সূচীতে প্রেরণা সৃষ্টিকারী বৈচিত্র্যও আনা সম্ভব। ইতিপূর্বেও স্কুল কম্প্লেক্স স্থাপনের দ্বারা রাজ্য শিক্ষা সংস্থা এ বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছিলেন। নতুন প্রাথমিক শিক্ষাক্রম রূপায়ণের কাজেও পরস্পর সহযোগী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির অভিজ্ঞতা আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রে যাতে কাজে লাগানো যায়, সেজন্যেও রাজ্য শিক্ষা সংস্থা বাণীপুর সন্নিহিত এলাকায় উৎসাহী বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের এ বিষয়ে আগ্রহী করে তোলার প্রকল্প নিয়েছেন।

(৮) প্রকাশনা :

প্রাথমিক শিক্ষাক্রম রূপায়ণের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের জন্য বিশেষ ধরণের পত্রপত্রিকা পুস্তকাদি প্রকাশনার গুরুত্ব সম্পর্কে রাজ্য শিক্ষা সংস্থা অবহিত আছেন। বস্তুতঃ রাজ্যের অজস্র শিক্ষকের কাছে শিক্ষাক্রম রূপায়ণে রাজ্য শিক্ষা সংস্থার সংগৃহীত তথ্যাদি, আলোচনা সভার বিবরণাদি, অন্যান্য রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম রূপায়ণের খবরাদি জনসংযোগ বা সহযোগী বিদ্যালয় প্রকল্পের অভিজ্ঞতার সুফল পৌঁছে দিতে হলে যে ধরণের প্রকাশনা প্রয়োজন সে সম্পর্কেও সংস্থা সম্পূর্ণ সচেতন আছেন।

অগ্রগতি ঃ

গত ছয়মাসে সম্মিলিত উদ্যোগে উল্লিখিত কার্যক্রমের প্রায় সব ক্ষেত্রেই রাজ্য শিক্ষা সংস্থা আশাব্যঞ্জক অগ্রগতি করেছে। কোনো কোনো কাজ যেমন শেষ হয়েছে তেমনি অন্যান্য ক্ষেত্রে দ্রুততালে পদসঞ্চার লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের সফল রূপায়ণ সম্পর্কিত কাজগুলির বিস্তারিত বিবরণ পৃথকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। মনস্ক পাঠক লক্ষ্য করবেন এই কাজে সম্পূর্ণ সাফল্য সময়ের প্রেক্ষাপটে বিচার্য হলেও উৎসাহী শিক্ষকদের মধ্যে রাজ্য শিক্ষা সংস্থা রীতিমত সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে। বাণীপুর-হাবড়া-অশোকনগর-বারাসাত প্রভৃতি এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাক্রম রূপায়ণে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের অভিজ্ঞতা,

জনগণের সহযোগিতা প্রভৃতির ফলাফল যথাসময়ে বিচার বিশ্লেষণ করে এ রাজ্যের অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির কাছে তুলে ধরা হবে।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাষা ও গণিত বই দুটি শিক্ষাক্রমের নির্ধারিত উদ্দেশ্যের আলোয় বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা হয়েছে।

মাতৃভাষা বাংলা পঠন-পাঠনের উদ্দেশ্যানুসারে শিক্ষার্থীর আচরণগত উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, পর্যায় অনুসারে বিষয়-এককের বিন্যাসও করা হয়েছে।

গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকার জন্য মালমশলা সংগ্রহ এবং ভাষান্তরের একটি কাজ যথানির্দিষ্ট সময়েই সমাপ্ত।

স্বাস্থ্য শরীর শিক্ষা ও খেলাধূলা সম্পর্কিত সহায়ক পুস্তিকা রচনার ভিত্তিস্বরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজও শেষ হয়েছে।

সহযোগী বিদ্যালয়গুলিকে নিয়ে দুটি স্কুল কম্প্লেক্স স্থাপনের কাজেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে এবং আরও প্রায় বারোটি স্কুল কম্প্লেক্স গঠনের কাজ চলছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য একটি নমুনা সময় পত্রিকাও রচনা করা হয়েছে।

নিম্নবুনিয়াদী শিক্ষক শিক্ষণ সংস্থাসমূহের জন্য প্রস্তাবিত নতুন শিক্ষাক্রমের ভিত্তিস্বরূপ একটি কাঠামো শিক্ষাক্রম রচিত হয়েছে। এই সিলেবাস সংগঠন কমিটিতে রাজ্য শিক্ষা সংস্থার ভারপ্রাপ্ত উপাধ্যক্ষ যথাযোগ্য দায়-দায়িত্ব ও ভূমিকা পালন করেছেন।

শিক্ষার্থীদের শ্রেণীতে আটক না রাখার যে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব সৃষ্টিকারী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তার প্রকৃত তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে সংস্থার ভারপ্রাপ্ত উপাধ্যক্ষ শ্রীনিঃশঙ্ক ঘোষ মহাশয় যে সুচিন্তিত প্রবন্ধ রচনা করেছেন ইতিমধ্যেই তা সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছে।

প্রতিবেদন ঃ
প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম রূপায়ণ

রাজ্য শিক্ষা সংস্থা আয়োজিত প্রধান/সহ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আলোচনা সভার বিবরণ

উনিশ শত একাশি সালে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র নতুন প্রাথমিক শিক্ষাক্রম প্রবর্তিত হয়েছে। নতুন শিক্ষাক্রম যাতে যথাযথভাবে রূপায়িত হতে পারে সেজন্যে বিবিধ কার্যক্রমও গৃহীত হয়েছে। এগুলির অন্যতম হল রাজ্যের প্রায় পঞ্চাশ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের জন্য স্বল্পকালীন শিক্ষাক্রম-অভিমুখী প্রশিক্ষণ (ওরিয়েন্টেশন্) কার্যক্রম। কিন্তু এ ধরণের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম যেমন একদিকে দু-চার মাসের মধ্যে শেষ করা সম্ভব নয় তেমনি অপর দিকে সময়ের স্বল্পতার জন্যে নতুন শিক্ষাক্রমের সকল দিকে বিস্তারিত আলোচনা করাও সম্ভব নয়।

এ ধরণের বাস্তব অসুবিধার অস্তিত্ব মেনে নিয়েও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিক্ষা সংস্থা নতুন শিক্ষাক্রম যাতে মোটামুটি কার্যকরীভাবে বিদ্যালসমূহে অনুসৃত হতে পারে সেজন্যে সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছেন। এগুলির মধ্যে অন্যতম হল রাজ্য শিক্ষা সংস্থার সন্নিহিত অঞ্চল—বাণীপুর, হাবড়া, অশোকনগর, বারাসাত এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের বাস্তব অবস্থা-সমস্যাদি সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ করে নতুন শিক্ষাক্রম রূপায়ণে বিদ্যালয়সমূহকে প্রয়োজনীয় সম্ভাব্য সহায়তা প্রদান।

বাণীপুর, হাবড়া, অশোকনগর, বারাসাত (চব্বিশ পরগণা) এলাকাসমূহের প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁরা এ বিষয়ে খুবই উৎসাহ প্রকাশ করেন এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন শিক্ষাক্রম রূপায়ণে রাজ্য শিক্ষা সংস্থার যে কোনো প্রয়াসের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন।

হাবড়া-বাণীপুর এলাকার বিদ্যালয় পরিদর্শকদের আহ্বানে গত ১৮/৫/৮১ ও ২১/৫/৮১ তারিখে রাজ্য শিক্ষা সংস্থার ভারপ্রাপ্ত উপাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নিঃশঙ্ক ঘোষ, সংস্থার অন্যান্য শিক্ষকগণসহ স্থানীয় ৩০জন উৎসাহী প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকার সঙ্গে বিদ্যালয় পরিদর্শকদের কার্যালয়ে মিলিত হন। উপস্থিত প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ নিজ নিজ বিদ্যালয়ে নতুন প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের সফল রূপায়ণে উৎসাহ প্রকাশ করেন এবং এ বিষয়ে রাজ্য শিক্ষা সংস্থার যে কোনো প্রয়াসকে তাঁরা স্বাগত জানাবেন বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে জানা গেল তাঁদের অধিকাংশই এখনো শিক্ষাক্রম-অভিমুখী প্রশিক্ষণ নেবার সুযোগ পাননি এবং সহ শিক্ষকগণও আপাততঃ কোনোরূপ প্রশিক্ষণের সুযোগ পাবেন না। এ রকম পরিস্থিতিতে এবং বিদ্যালয়ের অন্যান্য কয়েকটি সমস্যার জন্য নতুন শিক্ষাক্রম রূপায়ণে প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন।

রাজ্য শিক্ষা সংস্থার ভারপ্রাপ্ত উপাধ্যক্ষ মহাশয় উপস্থিত প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংস্থার প্রকাশিত শিক্ষাক্রম সম্পর্কিত কয়েকটি সহায়ক পুস্তিকা প্রদান করেন এবং আশা প্রকাশ করেন— পুস্তিকাগুলির সাহায্যে তাঁরা কিছুটা উপকৃত হবেন। যে সকল বিষয় পূর্ববর্তী শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল বা যেগুলি সরাসরি পুস্তকনির্ভর নয়,—যেমন শরীরশিক্ষা ও খেলাধূলা, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও সামুদায়িক কার্যাবলী কিংবা হাতের কাজ—এগুলি যাতে অবিলম্বে বিদ্যালয়ে যথাযথ গুরুত্ব সহকারে বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কার্যক্রমের অন্তর্গত হয় সে বিষয়ে সচেষ্ট হবার জন্যেও উপাধ্যক্ষ মহাশয় অনুরোধ করেন।

যথাশীঘ্র রাজ্য শিক্ষা সংস্থায় সম্মিলিত হয়ে শিক্ষাক্রমের সফল রূপায়ণের জন্য আশু কি কি কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়, এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্যে প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ আলোচনা সভার আয়োজনের অনুরোধ জানালে উপাধ্যক্ষ মহাশয় সম্মত হন।

রাজ্য শিক্ষা সংস্থার উদ্যোগে স্থানীয় বিদ্যালয় পরিদর্শকদের উপস্থিতি ও সহযোগিতায় বাণীপুরে দুটি এবং বারাসাত প্রিয়নাথ বিদ্যালয়ে একটি আলোচনা সভা গত ৬/৮/৮১, ২৭/৮/৮১ এবং ৩/৯/৮১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত আলোচনা সভাগুলিতে সংশ্লিষ্ট এলাকায় ১১৯ জন প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকা উপস্থিত ছিলেন।

বেলা এগারোটা থেকে সাড়ে চারটা পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে একদিনের উল্লিখিত আলোচনা সভাগুলিতে উপস্থিত শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের পরিচয় পর্ব এবং রাজ্য শিক্ষা সংস্থার ভারপ্রাপ্ত উপাধ্যক্ষ মহাশয়ের স্বাগত ভাষণের পরে আলোচনা সভার মূল উদ্দেশ্য উপস্থাপিত করা হয়। উপাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ঘোষ আলোচনা সভার উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের বাস্তব অসুবিধা ও সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন শিক্ষাক্রম রূপায়ণে প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ অবিলম্বে যে সকল কার্যক্রম নিতে পারেন এবং ঐ সকল গৃহীত কার্যক্রম অনুসরণের জন্য রাজ্য শিক্ষা সংস্থার সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেও কতটুকু এবং কি ধরণের সহায়তা তাঁদের প্রয়োজন সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান।

উপস্থিত প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ স্ব-স্ব বিদ্যালয়ের বিশেষ বিশেষ সমস্যাদির স্বরূপ বিস্তারিত-ভাবে আলোচনার পূর্বে রাজ্য শিক্ষা সংস্থা কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গের অর্ধ শতাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের

বাস্তব অবস্থা এবং সমস্যাদির বিষয়ে একটি নমুনা সমীক্ষায় (জাতীয় শিক্ষা গবেষণা, প্রশিক্ষণ সংস্থা, দিল্লীর সহযোগিতায়) প্রাপ্ত তথ্যাদির বিশ্লেষণ উপস্থাপিত করা হয়।

প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ নতুন শিক্ষাক্রম রূপায়ণের ক্ষেত্রে যে সকল অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন সেগুলির প্রধান প্রধান কয়েকটি হল—

(১) নতুন শিক্ষাক্রম-পুস্তিকাটি এখনো অধিকাংশ বিদ্যালয়ে না যাওয়ায় তাঁরা এ বিষয়ে তেমন অবহিত হতে পারেননি।

(২) শিক্ষাক্রম-অভিমুখী প্রশিক্ষণে যাবার সুযোগ এখনো অধিকাংশ প্রধান শিক্ষকগণ পাননি। যাঁরা পেয়েছেন তাঁরাও স্বল্প সময়ের প্রশিক্ষণে শিক্ষাক্রমের সকল দিক সম্পর্কে সুষ্ঠুভাবে অবহিত হতে পারেননি। ফলে সহ শিক্ষকগণের সহযোগিতায় শিক্ষাক্রম প্রসঙ্গে কার্যকরী উদ্যোগ প্রধান শিক্ষকগণের পক্ষে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

(৩) অধিকাংশ বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পাঠ্যপুস্তক এখনো পৌঁছায়নি।

(৪) বিদ্যালয়-গৃহগুলির ভগ্নদশা, কক্ষ সংখ্যার স্বল্পতার জন্য পঠন-পাঠন এবং আসবাবপত্র বা উৎপাদিত দ্রব্যাদি রক্ষণাবেক্ষণের অসুবিধা রয়েছে।

(৫) শ্রেণী অনুপাতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক না থাকার ফলে একই সঙ্গে একাধিক শ্রেণী-পাঠনার সমস্যা আছে।

(৬) ছাত্র অনুপাতে যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষক না থাকায় বৃহৎ শ্রেণীতে পঠন-পাঠন কার্য পরিচালনার অসুবিধা।

(৭) কয়েকটি বিষয়—যেমন শরীরচর্চা ও খেলাধূলার উপযোগী মাঠ না থাকা, হাতের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও কাঁচামালের অভাব এবং ঐ সকল বিষয় শেখানোর জন্য পারদর্শী শিক্ষকের অভাবও নতুন শিক্ষাক্রম রূপায়ণের ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায়।

(৮) নতুন শিক্ষাক্রমে যে ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের আটক না রাখার যে নীতি গৃহীত হয়েছে সে সম্পর্কে এখনো শিক্ষকগণ বিস্তারিত এবং সুস্পষ্টভাবে অবহিত হননি—ফলে নানা ধরণের বিভ্রান্তিকর যেসব ধারণা সৃষ্ট হচ্ছে—যা অবিলম্বে স্পষ্টীকৃত না হলে শ্রেণীপাঠনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদ্ধতি অনুসরণের ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না।

(৯) ছাত্রছাত্রীদের একটা বড় অংশ অভুক্ত বা অর্ধভুক্ত অবস্থায় বিদ্যালয়ে আসে, যার ফলে শিক্ষাক্রমের যথাযথ কার্যক্রম অনুসরণ করা যাচ্ছে না।

(১০) নতুন শিক্ষাক্রম সম্পর্কে স্থানীয় জনগণ ও অভিভাবকগণের সচেতনার অভাবও বিদ্যালয়ে কোনো কোনো কার্যসূচী, যেমন—সামুদায়িক কাজকর্ম, খেলাধূলা, হাতের কাজ প্রভৃতি অনুসরণের পথে বাধা সৃষ্টি করে থাকে।

উল্লিখিত সমস্যা ও অসুবিধাগুলি সম্পর্কে উপস্থিত অভিজ্ঞ শিক্ষকবৃন্দ পরস্পর মত বিনিময় করেন। রাজ্য শিক্ষা সংস্থার উপাধ্যক্ষ ও শিক্ষকগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সমস্যাগুলির স্বরূপ বিশ্লেষণের পরে সর্বসম্মতভাবে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হয়—

(১) যে সকল সমস্যা ও অসুবিধার ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণ ও অভিভাবকগণের সাহায্য এবং সচেতনতা আবশ্যক সেগুলি সম্পর্কে যথাশীঘ্র আরও বিস্তৃত ক্ষেত্রে যোগাযোগ এবং আলোচনার জন্য বিদ্যালয় পরিদর্শক এবং রাজ্য শিক্ষা সংস্থার সহায়তার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ প্রধান শিক্ষকগণ গ্রহণ করবেন।

(২) পর্যাপ্ত সংখ্যক পাঠ্যপুস্তক, সহায়ক পুস্তিকা প্রভৃতি যাতে যথাশীঘ্র বিদ্যালয়ে পৌছে সেজন্যে রাজ্য শিক্ষা সংস্থা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবেন।

(৩) নতুন শিক্ষাক্রমের যে সকল বিষয় পাঠ্যপুস্তক-নির্ভর নয়, যেমন— শরীরচর্চা ও খেলাধূলা, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও সামুদায়িক কাজ, হাতের কাজ প্রভৃতি বিদ্যালয়ের পরিবেশ পরিস্থিতি অনুসারে যতটা সম্ভব অবিলম্বে বিদ্যালয়ের প্রাত্যহিক কর্মসূচীতে যথোচিত গুরুত্ব সহকারে স্থান পাবে। বড় খেলার মাঠ ছাড়াও যে সকল খেলাধূলা সম্ভব, স্বল্প আয়াস বা স্বল্প উপকরণ নিয়ে যে সকল কাজ করা সম্ভব সেগুলির দিকেই বিশেষ জোর দেবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কোনো কোনো বিষয়ে শিক্ষকের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য রাজ্য শিক্ষা সংস্থা অদূর ভবিষ্যতে স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ (যেমন শরীরচর্চা ও খেলাধূলার ক্ষেত্রে) বা সহায়ক পুস্তিকা প্রণয়ন করে শিক্ষকদের সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

(৪) প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রেণীকক্ষ না থাকার ফলে বা শ্রেণী অনুপাতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক না থাকার ফলে একই সঙ্গে একাধিক শ্রেণীকে পাঠদানের যে বিশেষ সমস্যা তার কার্যকরী সমাধান আশু করা না গেলেও পাঠদান পদ্ধতি পরিবর্তনের সাহায্যে যে কিছুটা ফল পাওয়া সম্ভব সে সম্পর্কে শিক্ষকগণ একমত হন এবং তদনুসারে কার্যক্রম অনুসরণে সম্মত হন।

(৫) একটি শ্রেণীতে বহু সংখ্যক শিক্ষার্থীর সমস্যাটি খুবই গুরুতর হলেও ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় এ রাজ্যের শ্রেণীগুলিকে সকলক্ষেত্রে বৃহদায়তন বলা যায় না। তাছাড়া আরও বেশী শিক্ষক যতক্ষণ না পাওয়া যাচ্ছে—যার সম্ভাবনা অদূর ভবিষ্যতে খুবই কম—ততক্ষণ শিক্ষার্থীদের স্বশিখন, দলগত শিখন প্রভৃতি কৌশলের সাহায্যে শিক্ষার্থীর শিক্ষণকে যে সার্থক করে তোলা সম্ভব—এ বিষয়েও অধিকাংশ শিক্ষক একমত হন।

(৬) নতুন শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে সে সম্পর্কে শিক্ষক শিক্ষিকাগণ বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। বিশেষতঃ শ্রেণীতে আটকে না রাখার (non-detention) নীতি গৃহীত হওয়ার ফলে শ্রেণীকক্ষে পঠন-পাঠনের যে পরিবেশ দেখা দেবে

সে সম্পর্কে বিস্তৃত জানার জন্যও তাঁরা উৎসাহ দেখান। এ প্রসঙ্গে যথাশীঘ্র বিস্তারিত আলোচনার ব্যবস্থা এবং সহায়ক প্রবন্ধ পুস্তিকাদি সরবরাহের জন্য রাজ্য শিক্ষা সংস্থার যথাযথ উদ্যোগ নেবার সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়।

(৭) কয়েকজন প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকা তাঁদের এলাকায় কয়েকটি বিদ্যালয়ের পারস্পরিক সহযোগিতায় নতুন শিক্ষাক্রম রূপায়ণে রাজ্য শিক্ষা সংস্থার সহযোগিতা চাইলে ভারপ্রাপ্ত উপাধ্যক্ষ এ বিষয়ে সম্মত হন এবং যথাশীঘ্র সংশ্লিষ্ট এলাকার কোনো বিদ্যালয়ভবনে সম্মেলনের ব্যবস্থাদি করবার কথা বলেন।

বাণীপুর রাষ্ট্রীয় কল্যাণ ভবনের তিনটি প্রাথমিক বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের সঙ্গে ২০/৮/৮১ তারিখে ঐ বিদ্যালয় ভবনে রাজ্য শিক্ষা সংস্থার ভারপ্রাপ্ত উপাধ্যক্ষ ও শিক্ষকগণ মিলিত হন। কল্যাণ ভবনের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সামন্ত মহাশয়ও এই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

নতুন শিক্ষাক্রম-অভিমুখী প্রশিক্ষণ শিবিরে কল্যাণ ভবনের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ যাতে যোগদানের সুযোগ পান সেজন্যে রাজ্য শিক্ষা সংস্থার ভারপ্রাপ্ত উপাধ্যক্ষ মহাশয়কে তাঁরা অনুরোধ জানান। রাষ্ট্রীয় কল্যাণ ভবন প্রাথমিক বিভাগের সুযোগ-সুবিধা যেহেতু তুলনামূলকভাবে স্থানীয় সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির থেকে কিছুটা বেশী সেজন্যে নতুন শিক্ষাক্রম রূপায়ণে তাঁদের উৎসাহ উদ্দীপনা এবং কার্যক্রম অন্যান্য বিদ্যালয়গুলির কাছে প্রেরণাস্বরূপ হতে পারে বলে উপাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নিঃশঙ্ক ঘোষ অভিমত ব্যক্ত করেন। কল্যাণ ভবন প্রাথমিক বিভাগের সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাই এ বিষয়ে উদ্যোগ নিতে সম্মতি প্রকাশ করেন।

একটি আদর্শ সময় পত্রিকা রচনার জন্য তাঁরা সংস্থাকে অনুরোধ জানালে ভারপ্রাপ্ত উপাধ্যক্ষ মহাশয় যথাশীঘ্র এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেবার কথা জানান। কল্যাণ ভবনের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ যাতে নতুন শিক্ষাক্রমের সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন সেজন্যে কয়েকটি সহায়ক পুস্তিকা ও শিক্ষাক্রম পুস্তিকা সংস্থার পক্ষ থেকে পড়বার জন্য তাঁদের দেওয়া হয়।

যে সকল শিক্ষক স্ব-স্ব এলাকায় পারস্পরিক সহযোগিতায় শিক্ষাক্রম রূপায়ণে রাজ্য শিক্ষা সংস্থার সহায়তায় সম্মেলনের কথা বলেছিলেন, তাঁদের আহ্বানে এ পর্যন্ত দুটি এলাকার সম্মেলনে রাজ্য শিক্ষা সংস্থার ভারপ্রাপ্ত উপাধ্যক্ষ সংস্থার শিক্ষকগণসহ উপস্থিত ছিলেন। এই দুটি সম্মেলন যথাক্রমে ৫/৯/৮১ তারিখে দক্ষিণ নাংলা উচ্চ বিদ্যালয়ে এবং ৮/৯/৮১ তারিখে শ্রীনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমটিতে ৪৭ জন এবং দ্বিতীয়টিতে ৬১ জন প্রধান/সহ শিক্ষক-শিক্ষিকা উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত

স্থানীয় শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ নতুন শিক্ষাক্রম রূপায়ণে তাঁদের আগ্রহ জ্ঞাপনের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল সমস্যা ও অসুবিধার কথা উল্লেখ করেন রাজ্য শিক্ষা সংস্থার উপাধ্যক্ষ ও শিক্ষকগণ সেগুলির আলোচনা করেন। সংস্থার পক্ষ থেকে এই ধরণের আলোচনা সভা মাঝে মাঝে অনুষ্ঠিত হলে তাঁরা আরও উপকৃত এবং উৎসাহিত হবেন বলেই শিক্ষকগণ মত প্রকাশ করেন।

রাজ্য শিক্ষা সংস্থায় এবং বিভিন্ন বিদ্যালয় কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভার সবগুলিতেই স্থানীয় বিদ্যালয় পরিদর্শক মহাশয়গণ উপস্থিত ছিলেন এবং নতুন শিক্ষাক্রম রূপায়ণে তাঁদের সর্বপ্রকার সহযোগিতা এবং প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থাদি অবলম্বনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবার প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করেন।

রচনা:
শ্রীআলোক মাইতি

সহায়তা:
শ্রীমতী কৃষ্ণা বসু
শ্রীনিমাইদাস দত্ত
শ্রীসুধাংশুশেখর সেনাপতি

রাজ্য শিক্ষা সংস্থার উদ্যোগে
প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম সম্পর্কিত বিভিন্ন আলোচনাসভায় উপস্থিত
প্রধান/সহঃ শিক্ষক-শিক্ষিকার নাম

স্থান :

অবর-বিদ্যালয় পরিদর্শকের কার্যালয়-বাণীপুরচক্র

১৮/৫/৮১ তাং

ক্রঃ নং	নাম	বিদ্যালয়ের নাম
১।	সর্বশ্রী কেশবলাল পোদ্দার—	বাগডাঙ্গা
২।	দয়ালচন্দ্র বিশ্বাস—	নাংলা
৩।	প্রবোধকুমার মিত্র—	রাজ বল্লভপুর
৪।	পূর্ণিমা রায়চৌধুরী—	বিধানচন্দ্র
৫।	আজিজুর রহমান দফাদার—	লক্ষ্মীপুল
৬।	মহঃ ফজলুর রহমান তরফদার—	আটুলিয়া
৭।	দেবপ্রসাদ বসু—	হীরাপোল
৮।	বিজয়কুমার বাগচী—	টুনিঘাটা
৯।	গোবিন্দপদ ঘোষ—	নিমতলা
১০।	মহঃ আমিনুল খান—	মরফপুর
১১।	হরলাল মজুমদার—	বেতফুল
১২।	মহঃ আবতুস সামাদ—	পৃথিবা
১৩।	আবতুল মোতালেফ—	দক্ষিণ সরাই
১৪।	আবতুর রউফ মুন্সী—	বালুইগাছি
১৫।	রামলাল অধিকারী—	সালতিয়া ফুলতলা
১৬।	শচীন্দ্রনাথ দত্ত—	মিলনী
১৭।	বুদ্ধিমন্ত বিশ্বাস—	আখোলা

অবর-বিদ্যালয় পরিদর্শকের কার্যালয়-বাণীপুরচক্র

২১/৫/৮১ তাং

ক্রঃ নং	নাম	বিদ্যালয়ের নাম
১৮।	সর্বশ্রী বিমলকৃষ্ণ দে—	শ্রীমা
১৯।	পূর্ণিমা রায়চৌধুরী—	বিধানচন্দ্র
২০।	সর্বশ্রী দয়ালচন্দ্র বিশ্বাস—	নাংলা
২১।	অজয়কুমার মুখার্জী—	সালুয়া উলুডাঙ্গা
২২।	কিরণচন্দ্র পাল—	আনোয়ারবেড়িয়া
২৩।	বুদ্ধিমন্ত বিশ্বাস—	আখোলা নবপল্লী
২৪।	দেবপ্রসাদ বসু—	হীরাপোল
২৫।	মহঃ আমিনুল ইসলাম—	মরফপুর
২৬।	আবতুস সামাদ—	পৃথিবা
২৭।	ফজলুর রহমান তরফদার—	আটুলিয়া

রাজ্য শিক্ষা সংস্থা

৬/৮/৮১ তাং

ক্রঃ নং	নাম	বিদ্যালয়ের নাম
২৮।	সর্বশ্রী গুরুদাস মণ্ডল—	বল্লভপুর
২৯।	দয়ালচন্দ্র বিশ্বাস—	নাংলা
৩০।	সুমন্তকুমার বিশ্বাস—	টুনিঘাটা
৩১।	নিশিকান্ত মণ্ডল—	বামনডাঙ্গা
৩২।	শ্যামাপদ তালুকদার—	দক্ষিণ তালসা
৩৩।	মুকুন্দলাল হাওলাদার—	গুমা
৩৪।	বিনয়েন্দ্রনাথ সরকার—	অশোকনগর
৩৫।	সুমিতা মিত্র—	অশোকনগর আদর্শ
৩৬।	শোভা দত্ত —	শ্রীঅরবিন্দ
৩৭।	যমুনা সরকার—	নেতাজী সুভাষ
৩৮।	কেশবলাল পোদ্দার—	বাগডাঙ্গা
৩৯।	শান্তিরঞ্জন দত্ত—	বাণীপুর

ক্রঃ নং	নাম	বিদ্যালয়ের নাম
৪০	সর্বশ্রী চিন্ময়কুমার কুণ্ডু,	শিক্ষাসদন
৪১	কিরণচন্দ্র পাল,	আনোয়ারবেড়িয়া
৪২	দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ,	দোগাছিয়া
৪৩	ননীগোপাল বিশ্বাস,	মাণিকতলা
৪৪	মহঃ আবতুল গণি,	তাজপুর
৪৫	অশোকানন্দ রায়,	নব ভারতী
৪৬	দেবপ্রসাদ বসু,	হীরাপোল
৪৭	অদ্বৈতচন্দ্র দে,	নৃপেন্দ্র
৪৮	বিমলকৃষ্ণ দে,	শ্রীমা
৪৯	মৃণালকান্তি নাথ,	আচার্য পি. সি. কলোনী
৫০	গদাধর মণ্ডল,	বালিসা
৫১	অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়,	সালুয়া উলুডাঙ্গা
৫২	শচীন্দ্রনাথ দত্ত,	মিলনী
৫৩	ভৈরবানন্দ চক্রবর্ত্তী,	কাঁকপুল
৫৪	জিতেন্দ্রমোহন দত্ত,	নয়া সমাজ
৫৫	কালীপদ দে বিশ্বাস,	দক্ষিণ কল্যাণগড়
৫৬	বিমলকুমার দাস,	দ্বাদশপল্লী
৫৭	শেখ গোলাম বারী,	বারুইহাটী
৫৮	অতুলকৃষ্ণ ঘোষ,	নারায়ণপুর
৫৯	গোবিন্দনাথ চৌধুরী,	প্রজ্ঞানানন্দ
৬০	সুকুমার চট্টোপাধ্যায়,	বাইগাছি
৬১	কল্যাণী মিত্র,	হাবড়া
৬২	পূর্ণিমা রায়চৌধুরী,	বিধানচন্দ্র
৬৩	মৃণালিনী বিশ্বাস,	হিজলপুকুরিয়া
৬৪	সতীশচন্দ্র দে,	সংহতি

রাজ্য শিক্ষা সংস্থা

২৭/৮/৮১ তাং

ক্রঃ নং	নাম	বিদ্যালয়ের নাম
৬৫	সর্বশ্রী অধীরকুমার বিশ্বাস,	মছলন্দপুর
৬৬	হরলাল মজুমদার,	বেতপুল
৬৭	অজয়কুমার বাগচী,	শক্তিনগর
৬৮	কালীপদ ঘোষ,	আমড়া ডহরথুবা
৬৯	নরেন্দ্রনাথ সরকার,	শ্রীনগর
৭০	আপ্তার আলী গোলদার,	হায়দারবেলিয়া
৭১	মায়া দত্ত,	শ্রীকৃষ্ণ
৭২	হৃষিকেশ ভট্টাচার্য্য,	দিঘড়া
৭৩	আজিজার রহমান দফাদার,	লক্ষ্মীপুল
৭৪	মৃণালকান্তি ব্যানার্জী,	হিজলপুকুরিয়া আদর্শ
৭৫	মঃ মনসুর আলী,	কইপুকুর
৭৬	কানাইলাল দাস,	জয়গাছি
৭৭	নির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ,	জয়গাছি আদিবাসী
৭৮	মুকুলবিকাশ ভট্টাচার্য্য,	ডহরথুবা
৭৯	মহঃ আবতুস সামাদ,	জিরেনগাছা
৮০	সুকৃতিকুমার ঘোষ,	পৃথিবা
৮১	মনোরঞ্জন সাহা,	জিওলডাঙ্গা
৮২	নিখিল চক্রবর্তী,	বিড়া
৮৩	নিতাই গঙ্গোপাধ্যায়,	দক্ষিণ দৌলতপুর
৮৪	সুবোধকুমার রায়চৌধুরী,	শ্রীনগর
৮৫	মঃ আমিনুল ইসলাম,	মারাফপুর
৮৬	রাধেশ্যাম শিকদার,	রামকৃষ্ণ
৮৭	দিলীপকুমার ঘোষ,	রাজীবপুর
৮৮	মোঃ আবতুর রসিদ,	টেংরা
৮৯	কৃষ্ণচন্দ্র মুখার্জী,	তালসা
৯০	জিতেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী,	কাদপুর
৯১	হারাধন চট্টোপাধ্যায়,	রাণীডাঙ্গা
৯২	প্রবোধকুমার মিত্র,	রাজবল্লভপুর
৯৩	সতীন্দ্রচন্দ্র চন্দ,	বিড়া
৯৪	বিজয়রঞ্জন গুন,	কয়াডাঙ্গা

ক্রঃ নং	নাম	বিদ্যালয়ের নাম
৯৫	সর্বশ্রী সত্যরঞ্জন দাস,	কয়াডাঙ্গা দেশবন্ধু
৯৬	ধীরেন্দ্রনাথ দাস,	১নং উন্নয়ন পরিষদ
৯৭	যতীন্দ্রনাথ সাহা,	কামারথুবা
৯৮	কৃষ্ণকান্ত দেবনাথ,	দক্ষিণ কামারথুবা
৯৯	পঞ্চানন দাস,	জয়গাছি পল্লীমঙ্গল
১০০	ফণীভূষণ রায়,	আক্রামপুর
১০১	সুবলচন্দ্র ঘোষ,	তাজপুর
১০২	গোপাল রায়,	রাউতাড়া
১০৩	আবদুর রউফ মুন্সী,	বালুছগাছি

বারাসাত প্রিয়নাথ ইনষ্টিটিউশন্
৩/৯/৮১ তাং

ক্রঃ নং	নাম	বিদ্যালয়ের নাম
১০৪	সর্বশ্রী কল্যাণকুমার দত্ত,	বারাসাত আদর্শ
১০৫	কাজী আবদুল হালিম,	নর্থ কাজী
১০৬	জগন্নাথ সিং,	পণ্ডিত জওহরলাল
১০৭	গণেশচন্দ্র দে,	মহেশ্বরপুর
১০৮	নির্ম্মল চট্টোপাধ্যায়,	বারাসাত দক্ষিণপাড়া
১০৯	কাজি মোহম্মদ হোসেন,	সাউথ কাজিপাড়া
১১০	সুকমল দাশগুপ্ত,	পঞ্চপল্লী
১১১	স্বপনকুমার ঘোষাল,	মহানন্দ মিশন
১১২	অমলকৃষ্ণ সান্যাল,	বারাসাত আদিবাসী
১১৩	সুনীল বিশ্বাস,	হরিমোহন নাথ
১১৪	নীতিশ মিত্র,	হরিতলা
১১৫	মণিমালা দেবী,	বারাসাত আরবান
১১৬	শৈলরাণী বসু,	মহেশ্বরপুর
১১৭	মঞ্জুলিকা ভট্টাচার্য,	ঐ
১১৮	জ্যোৎস্না ভট্টাচার্য,	নাদবালা
১১৯	সুনীতি ব্যানার্জী,	বাবা কালীকৃষ্ণ
১২০	গজমতী গাঙ্গুলী,	বামনপাড়া
১২১	তাপসী চক্রবর্তী,	উত্তরহাট
১২২	সর্বশ্রী স্মিতা বসু,	মানবতা
১২৩	বিজয়া গুহ,	মহাত্মা গান্ধী
১২৪	বীণাপাণি চক্রবর্তী,	অশ্বিনীপল্লী
১২৫	প্রিয়নাথ নিঃ বুনিঃ বিদ্যালয়,	বনমালিপুর
১২৬	রঘুনাথ ভট্টাচার্য,	গুস্তিয়া

প্রিয়নাথ প্রাথমিক বিদ্যালয়
৩/৯/৮১ তাং

ক্রঃ নং	নাম	বিদ্যালয়ের নাম
১২৭	সর্বশ্রী বিজয়বিহারী সরকার,	বিবেকানন্দ
১২৮	রতনকুমার দাস,	ইয়াকুব মেমোরিয়াল
১২৯	মৃণালকান্তি সরকার,	চৌধুরীপাড়া
১৩০	প্রিয়তোষ দাস,	সুবর্ণ পত্তন
১৩১	পবিত্রকুমার সরকার,	নরেন্দ্রপল্লী
১৩২	মানসকুমার ব্যানার্জী,	বিনোদিনী
১৩৩	সুধীররঞ্জন বসু,	নেতাজী আদর্শ
১৩৪	পান্নালাল কর,	মধুমুরলী
১৩৫	হরেন্দ্রনাথ কর্মকার,	বামনমুড়া
১৩৬	কাজি আবদুল ফতাহ,	উত্তর সিতি
১৩৭	কাজী সাখাওয়াৎ হোসেন,	কাজীপাড়া
১৩৮	কাজী হেলাল উদ্দীন,	দেশবন্ধু
১৩৯	প্রাণেশচন্দ্র মোদক,	আশুতোষপল্লী
১৪০	অজিতরঞ্জন হাজরা,	কৃষ্ণপুর
১৪১	স্বপনকুমার বিশ্বাস,	কবি সুকান্ত
১৪২	চুনীলাল কাঞ্জিলাল,	সৌরেশ স্মৃতি
১৪৩	কেশবলাল ভট্টাচার্য,	সত্যনারায়ণ
১৪৪	মহঃ জামালউদ্দিন,	দক্ষিণপাড়া
১৪৫	প্রীতিলতা দত্ত,	বিবেকানন্দ

দক্ষিণ নাংলা উচ্চ বিদ্যালয়
৫/৯/৮১ তাং

ক্রঃ নং	নাম	বিদ্যালয়ের নাম
১৪৬	ঝর্ণা রায়,	মশিয়া মছলন্দপুর
১৪৭	সন্ধ্যা দত্ত,	রুদ্রপুর কাশীপুর
১৪৮	সর্বশ্রী দীপ্তি মিত্র,	মশিয়া মছলন্দপুর
১৪৯	নীলিমা বসু,	ঐ
১৫০	জয়ন্তী ঘোষ (সরকার),	নাংলা
১৫১	স্নেহময়ী বর্দ্ধন,	কুমড়া
১৫২	বীণা চ্যাটার্জী,	ঐ
১৫৩	রেণুকা বিশ্বাস (রায়),	ঐ
১৫৪	জ্যোৎস্নারাণী দাস (মুন্সী),	বিজয়নগর
১৫৫	রেখা চক্রবর্তী,	ঐ
১৫৬	মনোরঞ্জন বসু,	স্বামীজি পল্লী
১৫৭	মোঃ আবদুল বারী,	মহিষা মছলন্দপুর
১৫৮	অমরেশ্বর বাড়ৈ,	বিজয়নগর
১৫৯	পরিমলকুমার বিশ্বাস,	মহিষা মছলন্দপুর
১৬০	বিমলকৃষ্ণ ঘোষ,	অগ্রদূত
১৬১	মনোরঞ্জন বিশ্বাস,	বিজয়নগর
১৬২	নিরঞ্জন বসু,	স্বামীজি পল্লী
১৬৩	নারায়ণচন্দ্র দে,	ঐ
১৬৪	বেদকণ্ঠ সরকার,	ঐ
১৬৫	কানাইলাল বিশ্বাস,	আবাদ-মাকালতলা
১৬৬	নির্ম্মলকান্তি দত্ত,	ঐ
১৬৭	মোঃ সামসুল হক,	রুদ্রপুর কাশীপুর
১৬৮	মোঃ মোজাম্মেল হক,	পাড়ুইপাড়া
১৬৯	নিরঞ্জন সরকার,	ঐ
১৭০	অশোককুমার হাজরা,	ঐ
১৭১	নলিনীরঞ্জন বিশ্বাস,	টুনিঘাটা
১৭২	বিজয়কৃষ্ণ মল্লিক,	রুদ্রপুর কাশীপুর
১৭৩	সর্বশ্রী শচীনন্দন বালা,	মশিয়া মছলন্দপুর
১৭৪	বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর,	বয়ারঘাটা
১৭৫	কুলন্দারঞ্জন বিশ্বাস,	রুদ্রপুর কাশীপুর
১৭৬	অনন্তকুমার মজুমদার,	আনখোলা
১৭৭	হারাণচন্দ্র মজুমদার,	রুদ্রপুর কাশীপুর
১৭৮	সুমন্তকুমার বিশ্বাস,	টুনিঘাটা
১৭৯	নিশিকান্ত মণ্ডল,	বামনডাঙ্গা
১৮০	বিরিঞ্চিপদ মণ্ডল,	আনখোলা
১৮১	হরিনারায়ণ বালা,	বয়ারঘাটা
১৮২	বিজয়কৃষ্ণ বাগচী,	টুনিঘাটা
১৮৩	দয়ালচন্দ্র বিশ্বাস,	নাংলা
১৮৪	ফণিভূষণ পোদ্দার,	কুমড়া
১৮৫	প্রবোধচন্দ্র দে,	বাগাডাঙ্গা
১৮৬	নরেন্দ্রনাথ দত্ত,	ঐ
১৮৭	মুকুন্দ বিশ্বাস,	কাশীপুর
১৮৮	কেশবলাল পোদ্দার,	বাগডাঙ্গা
১৮৯	সুভাষচন্দ্র বালা,	নাংলা
১৯০	ভবানী বিশ্বাস,	বাগাডাঙ্গা
১৯১	গণপতি বিশ্বাস,	দক্ষিণ নাংলা

শ্রীনগর বাস্তুহারা প্রাথমিক বিদ্যালয়
৮/৯/৮১ তাং

ক্রঃ নং	নাম	বিদ্যালয়ের নাম
১৯২	সর্বশ্রী সুবোধকুমার রায়চৌধুরী,	শ্রীনগর
১৯৩	তাপসকুমার দাস,	ঐ
১৯৪	অতুলকৃষ্ণ কুণ্ডু,	আক্রামপুর
১৯৫	ফণীভূষণ রায়,	ঐ
১৯৬	পঞ্চানন দাস,	জয়গাছি পল্লীমঙ্গল
১৯৭	সঞ্জয় সোম,	গোপালচন্দ্র
১৯৮	মধুসূদন দে,	সালতিয়া

ক্রঃ নং	নাম	বিদ্যালয়ের নাম	ক্রঃ নং	নাম	বিদ্যালয়ের নাম
১৯৯	সর্বশ্রী সুনীলরঞ্জন সরকার,	সালতিয়া	২২৬	সর্বশ্রী গীতা পাঠক,	জয়গাছি
২০০	নির্মলচন্দ্র ঘোষ,	জয়গাছি	২২৭	নিরুপমা ব্যানার্জী,	ঐ
২০১	নীলরতন বারুরী,	খারো কলোনী	২২৮	সন্ধ্যা বিশ্বাস,	ঐ
২০২	রঞ্জিতকুমার চক্রবর্তী,	গোহালবাটি	২২৯	রবীন্দ্রনাথ নন্দী,	ঐ
২০৩	তারকচন্দ্র সরকার,	জয়গাছি পল্লীমঙ্গল	২৩০	লতিকা ব্যানার্জী,	জয়গাছি পল্লীমঙ্গল
২০৪	আবদুল খালেক,	কইপুকুর	২৩১	ছায়া ঘোষ,	ঐ
২০৫	মনসুর আলী,	ঐ	২৩২	সুধা ঘোষ,	ঐ
২০৬	আদিত্যকুমার বিশ্বাস,	ঐ	২৩৩	পূর্ণিমা মিত্র,	ঐ
২০৭	স্বপনকুমার চক্রবর্তী,	শ্রীনগর	২৩৪	লীলা বল নিয়োগী,	ঐ
২০৮	নরেন্দ্রনাথ সরকার,	শ্রীনগর	২৩৫	মিনতি বসু,	আক্রামপুর
২০৯	বীরেন্দ্রনাথ নাথ,	খারো কলোনী	২৩৬	চায়না চক্রবর্তী,	ঐ
২১০	সতীশচন্দ্র নাথ,	গোহালবাটি	২৩৭	আলো চক্রবর্তী,	ঐ
২১১	জগন্নাথ রায়,	গোপালচন্দ্র	২৩৮	প্রতিমা সিংহরায়,	ঐ
২১২	দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ কর,	ঐ	২৩৯	দীপ্তি মল্লিক,	শ্রীনগর
২১৩	শঙ্করনারায়ণ দাসঠাকুর,	জয়গাছি	২৪০	পুষ্প দত্ত,	ঐ
২১৪	ছায়া দত্ত,	ঐ	২৪১	রেখা চক্রবর্তী,	নগরথুবা আদর্শ
২১৫	নারায়ণচন্দ্র ঘোষ,	জয়গাছি	২৪২	প্রতিমা গুহ,	ঐ
২১৬	জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্র,	খারো কলোনী	২৪৩	তপতী ঘটক (চক্রবর্তী)	ঐ
২১৭	মৃণালকান্তি ব্যানার্জী,	আদর্শ	২৪৪	গীতা বসু,	গোহালবাটি
২১৮	গীতাঞ্জলী রায়,	ঐ	২৪৫	রাজু বিশ্বাস,	কইপুকুর
২১৯	দীপ্তি ঘোষ,	ঐ	২৪৬	বিজয়া দাস (রক্ষিত),	গোপালচন্দ্র
২২০	অশোককুমার মজুমদার,	ঐ	২৪৭	আরতি পোদ্দার,	গোহালবাটি
২২১	বেলা দত্ত,	নেতাজী	২৪৮	রাধা পাল,	শ্রীনগর বাস্তুহারা
২২২	রেবা চট্টোপাধ্যায়,	ঐ	২৪৯	সুমিত্রা দাস,	ঐ
২২৩	বীণাপাণি দত্ত,	ঐ	২৫০	মঞ্জুরাণী লোধ,	ঐ
২২৪	দুর্গা চক্রবর্তী,	ঐ	২৫১	নীলিমারাণী সরকার,	শ্রীনগর
২২৫	রেখা আইচ,	ঐ	২৫২	কানাইলাল দাস,	জয়গাছি

কারিকুলাম ঃ কয়েকটি কথা

ডঃ শিবকুমার মিত্র

"All types of teaching-learning processes
that are planned and organised
to be experienced by learners
to achive defined educational objectives."
[Universalizing Education : Report of an APEID-1979, Page-89]

আজকাল শিক্ষাক্ষেত্রে 'কারিকুলাম' একটি বহুল ব্যবহৃত পদ। দশ বছর আগেও এটির ব্যবহার ছিল সীমিত। তখন লোকে 'সিলেবাস', 'টেক্স্ট বুক'-এর কথা বলত। তারও আগে 'পরীক্ষা', 'মূল্যায়ন', 'পরীক্ষা সংস্কার' এসব নিয়ে কথা বলত। দেখাই যাচ্ছে—একেক সময় একেকটা বিষয় শিক্ষাক্ষেত্রে আসর জাঁকিয়ে বসে।

শিক্ষার কতকগুলি সমস্যা আছে যা বিশ্বজনীন—যে জন্যে প্রত্যেকটি দেশই তার সমাধান নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে। "শিক্ষার লক্ষ্য" কি হবে এ রকমই একটা সমস্যা। সেই কোন্ যুগে প্লেটো পর্যন্ত শিক্ষার লক্ষ্য নিয়ে কথা বলেছিলেন। এখনো তাঁর কথা বলা হয়—যদিও আমরা হয়ত তাঁর নাম ব্যবহার করি না।

আমরা সকলেই জানি বিজ্ঞান ও কারিগরী ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতির ফলে সমাজে নানা ক্ষেত্রে দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। আমাদের দেশেও জীবনের প্রায় সব ক্ষেত্রে বড় বড় পরিবর্তন আসছে। দুর্ভাগ্য-বশতঃ শিক্ষাক্ষেত্রে কলকারখানার একটা পুরনো ধাঁচের যান্ত্রিক নক্শা ব্যবহৃত হচ্ছে। শিল্পক্ষেত্রে কাঁচামালগুলোকে পর্যায়ক্রমে বাছাই করে নিয়ে একদল শ্রমিক এক-একটা অংশ বানায় বা উৎপাদন স্তরের সঙ্গে যুক্ত থাকে। ফলে কোনো একজন কর্মী উৎপন্ন দ্রব্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থাকে না। শিল্পক্ষেত্রের এ ধরণের আদলেই শিক্ষাক্ষেত্রেও এ রকম বিভাজন করা হয়েছে।

শিক্ষা অধিকর্তা, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক, প্রধান শিক্ষক, সহ-শিক্ষক, প্রশ্নকর্তা—প্রত্যেকেই বিশেষ বিশেষ কাজ করছেন—পরিশেষে শিক্ষার্থী কি হয়ে উঠবে, এ বিষয়ে কেউই তেমন সচেতন নহেন।

আবার কারিগরী ক্ষেত্রের অটোমেশনের মতো শিক্ষাক্ষেত্রেও স্বয়ংক্রিয় পর্যায় বা স্তর বিন্যাস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ফলে কেবল যে কর্মীসংখ্যা কম লাগছে তা নয়—যন্ত্রপাতির কোনো অংশ বিকল হলে

এন, সি, ই, আর, টি-এর ডিরেক্টার ডঃ শিবকুমার মিত্রের মূল বক্তব্যের ভাবানুসরণ ভাষান্তর ঃ শ্রীআলোক মাইতি

তার ত্রুটি দূর করার পরিবর্তে সেগুলোকে বদলে দেওয়া হচ্ছে। ফলে যন্ত্রপাতি কেমন করে কাজ করে তার খুঁটিনাটি আদৌ জানতে হচ্ছে না। বস্তুতঃ এ ধরণের প্রক্রিয়া ক্রমশঃ বেড়েই চলবে।

এরকম দ্রুত পরিবর্তমান জগতে আমরা কি ধরণের শিক্ষার ব্যবস্থা করব? আমরা কি আমাদের ছেলেমেয়েরা ষোল পেরোবার আগেই তাদের ইলেকট্রনিক এবং সলিড়স্টেট পদার্থবিদ্যা শেখাবো? রাশিয়া, জার্মানী, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকার মতো উন্নত দেশগুলোতে ছেলেমেয়েদের জন্যে ইলেকট্রনিক খেলনা আছে। আমরা কি আমাদের ছেলেমেয়েদের পরিবর্তনশীল পৃথিবী—যা আমাদের কাছে অনিশ্চিত, তার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেব? কিছু লোক শিক্ষাকে কর্মমুখী (job oriented) করার কথা বলছেন। কর্মমুখী শিক্ষা প্রসঙ্গেই বিশেষীকরণের কথা এসে পড়ে। আমরা কি শিশুদের 'ক' কর্মের উপযোগী করে তুলব? যে 'ক' কর্মের জন্য আমরা শিশুকে প্রস্তুত করলাম এমন হতে পারে ওই কাজটাই থাকল না, ফলে শিশু আবার অনুপযুক্ত হয়ে গেল। আমরা কি শিশুদের একগুচ্ছ কর্ম শেখাব? বলা বাহুল্যমাত্র, কিছুকাল পরে ওই একগুচ্ছ কর্মের সুযোগ না-ও থাকতে পারে। এসব প্রশ্ন স্বতঃই উঠছে— ক্রমবর্ধমান বেকারীর জন্য। ভারতীয় শিক্ষা কমিশন শিক্ষাকে উৎপাদন এবং উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত করার যে কথা বলেছিলেন, অর্থ নৈতিক বিকাশ অতি ধীরগতিসম্পন্ন হওয়ায় তাও সফল হচ্ছে না। অর্থনীতিবিদ্গণ ইতিমধ্যেই বলতে শুরু করেছেন বেকারী থাকবেই—কেননা এটা দূর করা খুবই কঠিন। এটা ঘটনা—অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে কর্মহীনতার যোগ আছে। শিক্ষা—কাজ (employment) সৃষ্টি করতে পারে না, কিছু কাজের উপযুক্ত মানুষ গড়তে পারে। কিছু মানুষ আবার কর্ম উপযুক্ততার (employability) কথা বলছেন। জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গী, ধারণা, উপলব্ধি ইত্যাদির দিক থেকে এই "কর্ম উপযুক্ততা" বললেই বা কি বুঝায়? এর দ্বারা কি এটা বুঝায় যে ব্যক্তি তার উপযোগী যে কোনো ধরণের নিযুক্ত হতে পারবে? নাকি এমন একটা কিছু যাতে যাবতীয় অনিশ্চিত অবস্থার মুখোমুখি সে দাঁড়াতে সক্ষম হবে? তাহলে দেখা যাচ্ছে সামর্থ্যের (competencies) বিকাশ ঘটানো শিক্ষার লক্ষ্য।

অপরদিকে, আর একদল লোক ভিন্ন কথা বলছেন। তাঁরা জীবনযাপনের উৎকর্ষতাকে (quality of life) শিক্ষার লক্ষ্য বলতে চাইছেন। বলা বাহুল্যমাত্র, এটাও একটা অস্পষ্ট সংজ্ঞা। এর অর্থ পাঞ্জাবের কৃষকের কাছে এক রকম—বিহারের কৃষকের কাছে অন্য রকম। নাকি 'জীবনযাপনের উৎকর্ষতার' মধ্যে আধ্যাত্মিক কোনো বক্তব্য আছে? নাকি নিছক জাগতিক সুখ-সুবিধা-এর অন্তর্গত?

'শিক্ষার লক্ষ্যের' কথা বার বার বলতে হচ্ছে, কারণ এ প্রশ্ন ঘুরেফিরে এসেছে। এক সময়—ভারতে শিক্ষার লক্ষ্য ছিল স্বাধীন—স্বনির্ভর জাতি। আর এখন ভারত বিশ্বের দশম শিল্পোন্নত দেশ এবং আমেরিকা, রাশিয়ার পরেই কারিগরী জ্ঞানে দক্ষ তৃতীয় দেশ। বেশ কিছুকাল আগেই আমরা আণবিক শক্তির অধিকারী হয়েছি এবং এখন তো নিজস্ব উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।

পশ্চিমী দেশগুলির মানুষরা তো বলছেনই তাঁদের জাতীয় উৎপাদন খুবই উঁচুতে, বিজ্ঞান কারিগরী দক্ষতা অপরিসীম, ব্যক্তিগত জাতীয় আর অসাধারণ—কিন্তু তাঁদের সুখ নাই। বস্তুতপক্ষে অর্থনীতি বিন্যাস ও জীবনের উৎকর্ষতার কথা, সুখের কথা ('quality of life' and 'happiness') বলতে শুরু করেছেন। কারিকুলাম প্রস্তুতকারকদের কাছেও এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

কারিকুলাম উন্নয়নের (Curriculum Development) জন্য আমাদের অবশ্যই একটা দর্শন (vision) থাকবে। সংবিধান প্রণেতাগণ এই দর্শনের উল্লেখ করেছেন। সংবিধান থেকেই শিক্ষার লক্ষ্য নিরূপিত হবে। এটা সংবিধানের দৃষ্টিভঙ্গী অনুধাবন করে শিক্ষার জন্য নির্ধারণ এবং তার থেকে কারিকুলামের উদ্দেশ্য গঠন—বাস্তবিকই খুবই কঠিন কাজ। একথার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হল কারিকুলাম সংগঠনের পূর্ব শর্ত হল—জাতীয় দর্শন বা দৃষ্টি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা।

আজকের দিনে ভারতের দর্শন কি? বর্তমান সমাজ-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অন্যতম বিবেচ্য। কেননা এর মধ্যে থেকেই তো কাজ করতে হবে। জাতীয় সংহতি আর একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক —ভাষা, জাতপাত, আঞ্চলিকতাবাদ প্রভৃতি জাতীয় ঐক্য এবং একতার ধ্যান-ধারণার উপরে আঘাত করছে। কারিকুলাম সংগঠনের ক্ষেত্রে এটা অন্যতম দিগ্‌দর্শক, কেননা জাতির অস্তিত্বই তা না হলে বিপন্ন হবে।

কারিকুলাম প্রসঙ্গে অপর যে গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় দিক বিবেচ্য তা হল—দারিদ্র্য। প্রায় পঞ্চাশ ভাগ মানুষ দারিদ্র্য রেখার নীচে রয়েছেন। এ বিষয়ে শিক্ষা কিছু করতে পারে কি? কারিকুলামের ভেতর দিয়ে কি জনগণকে দারিদ্র্য দূরীকরণে অধিকতর সংবেদনশীল করে তোলা সম্ভব?

কারিকুলাম সংগঠনের পরে আর একটা জাতীয় সমস্যার কথা—সমাজ ও অর্থনীতি উভয় ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণের কথাও মনে রাখা দরকার। যে হারে বৈষম্য বাড়ছে তা জাতির ভবিষ্যৎ উন্নয়নের পথে গুরুতর বিপদের সৃষ্টি করতে পারে।

এই রকম বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ দিকের কথা বিবেচনা করার সঙ্গে সঙ্গে—শিশু শিক্ষার্থীর কথাই সবার আগে মনে রাখতে হবে। আজকে যে শিশুর বয়স মাত্র পাঁচ বছর—যে এই বছরই বিদ্যালয়ে প্রথম যাবে সে একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে পঁচিশে পা দেবে। সে হবে তখন শ্রমশক্তি এবং কর্মসংস্থান চাইবে। তাকে তখন এক তীব্র প্রতিযোগিতাময় জগতের সম্মুখীন হতে হবে। এ ধরণের প্রতিযোগিতায় জয়ী হবার জন্য কারিকুলাম কি করতে পারে? আমাদের দেখতে হবে—শিশুর মধ্যে যেন কোনো নঞর্থক দৃষ্টিভঙ্গী—কুসংস্কার, একপেশে মনোভাব, দুর্ভাবনা, নিরাপত্তার অভাববোধ, মানসিক ভারসাম্যহীনতা প্রভৃতি গড়ে না ওঠে। এটা লক্ষ্য করা গেছে ভাল ছেলেরা প্রায় সব সময়ই পরীক্ষায় পাওয়া নম্বর নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ। আমাদের শিশুদের শৈশব হারিয়ে যাচ্ছে। এভাবেই শিক্ষক, পরীক্ষক এবং বড়দের সম্পর্কে শিশুর মনোভাব গড়ে উঠেছে। ক্রমেই শিশুর মধ্যে সমাজের অসাধুতা সম্পর্কে মানসিকতা

তৈরী হচ্ছে। বিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের মধ্যে যা ঘটছে মনে রাখতে হবে তা বিদ্যালয়ের বাইরে যা সব হচ্ছে তারই প্রতিফলন। বুদ্ধিমান তরুণ ইন্টারভিউ বোর্ডের সম্মুখীন হয়, কিন্তু দেখতে পায় তার থেকে অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের যোগ্যতাসম্পন্ন কেউ যে কোনো ভাবেই হোক কাজ বাগিয়ে নিচ্ছে।

কিছু লোক বলেন পশ্চিমা ধাঁচের প্রতিযোগিতার বদলে আমাদের সহযোগিতা (co-operation) ধর্মী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এটা বলা সহজ, কিন্তু সমাজে যে ইঁদুরের দৌড় চলছে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। বিষয়টাকে যদি আমরা গুরুত্বপূর্ণ মনে করি তাহলে বুদ্ধিমান বাছাই (merit system) বন্ধ করতে হবে এবং পরীক্ষায় শতকরা নম্বর প্রথা তুলে দিতে হবে। দশ বছরের বিদ্যালয় কারিকুলামে এটা করার চেষ্টা হয়েছে—কিন্তু কার্যতঃ এটা শুরু করা হচ্ছে না—কেননা বাস্তবে তীব্র প্রতিযোগিতার পরিবেশ বিদ্যমান। আমাদের বিজ্ঞানীগণ দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন—গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহে অহেতুক বিলম্ব হচ্ছে বলে। একজন তরুণ বৈজ্ঞানিক এই বলে দেশ ছাড়ার যুক্তি দেখায় যথাসময়ে সে যদি কোনো গবেষণামূলক কাজ দেখাতে না পারে তাহলে জার্মানী বা অপর কোন দেশের কেউ তাকে হারিয়ে দেবে।

কেউই জানে না আগামী শতাব্দীটা কেমন হবে। এ বিষয়ে আমাদের একটা দৃষ্টি (vision) গড়ে তুলতেই হবে—কেননা সহজ জ্যোতিষ বা পরিসংখ্যান তত্ত্ব এখানে অচল। এটা কাদের দৃষ্টি হওয়া উচিত? রাজনৈতিক নেতা, বৈজ্ঞানিক, শিল্পপতি, কারিগরী বিজ্ঞানী, চিন্তাবিদ, দার্শনিক প্রভৃতি সকলের মধ্যেই এটা আসা উচিত। শিক্ষকরা কি ওঁদের দৃষ্টিকে প্রভাবিত করতে পারেন? উত্তরটা সম্ভবতঃ এই শিক্ষায় শিক্ষাবিদ্ পরোক্ষ প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেন। কারিকুলামের ভেতর দিয়ে যাঁরা জাতীয় উন্নয়ন চাইছেন তাঁদের সকলের চিন্তা-ভাবনাকেই শিক্ষা জগতের মানুষজন প্রভাবিত করতে পারেন।

বর্তমান কারিকুলাম শিক্ষার্থীকে জগতের মুখোমুখি হবার উপযোগী করে গড়ে তোলে না—এ রকম অভিযোগ প্রায়ই উত্থাপিত হয়। এখন আমাদের কি ধরণের কারিকুলাম আছে? এবং কিভাবে তার উন্নয়ন করা যায়? এ সমস্যার দুটো দিক আছে। প্রথমতঃ বর্তমানে যে পরিস্থিতি বিদ্যমান সে সম্পর্কে সমালোচনাধর্মী একটা বিশ্লেষণ করে দেখা এবং তারপর বিশ্লেষণ করে দেখা একবিংশ শতাব্দীতে এটা কি হবে? কেবল তখনই বর্তমান পরিস্থিতি এবং পরবর্তী শতাব্দীর মধ্যে যে ফাঁক রয়েছে তা পূরণ করার চেষ্টা করা যাবে।

আমাদের প্রায়ই এ প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়, আমরা কেন বারবার পাঠ্যবই লিখছি। এর একটা উত্তর হল পাঠ্যবই কারিকুলামকে মূর্ত করে তুলে। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা গ্রন্থাগারের সুযোগ-সুবিধা তেমন পায় না—তাই পাঠ্যবইটা তাদের অন্ততঃ থাকুক। বস্তুতঃ পাঠ্যবই-ই হল একমাত্র বই যা অধিকাংশ ছাত্র এবং শিক্ষকের কাছে থাকা সম্ভব। আমরা কি আগামী দশ বছরের জন্য কোন পাঠ্যপুস্তক তৈরী করতে সক্ষম? বর্তমান পরিস্থিতিতে এটা আমরা পারি না।

বিদ্যালয়ে এখন ম্যাট্রিক্স অ্যালজেবরা (Matrix Algebra) এসে গেছে। বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে শিক্ষার্থীকে ম্যাট্রিক্স অ্যালজেব্রার পরিবেশেও পড়তে হয়। এমন কি একটা সাধারণ পত্র-পত্রিকা বা খবরের কাগজ পড়তে হলেও আজকের শিশুকে বুলিয়ন, শেয়ার, প্রাইস ইন্‌ডেকস, স্যাটেলাইট ইত্যাদি অজস্র বিষয়ে পরিচিত থাকতে হয়। আমরা আগে জানতাম আমাদের পৃথিবীর একটি মাত্র উপগ্রহ, তা হল চাঁদ। কিন্তু এখন আর এ তথ্য সত্য নয়—পৃথিবীর এখন একাধিক উপগ্রহ। আজকের দিনে জনগণ প্রায়ই পরিবেশ দূষণ-এর কথা শুনে থাকেন। কিন্তু সমস্যা হল এসব ধারণা শিশুদের কাছে কিভাবে তুলে ধরা যাবে। বর্তমানে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞানও বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। পুনরায় এক্ষেত্রেও আমাদের সমস্যা হল শিশুদের কেমন করে মানব-মস্তিষ্ক, ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদির জ্ঞান দেওয়া যাবে।

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে বর্তমানের শিশুকে এমন অনেক কিছু শিখতে হবে যার সঙ্গে তার মা-বাবার কোনো পরিচিতিই ছিল না। আর এ রকম পরিস্থিতিতে কারিকুলামের একটা উদ্দেশ্য অবশ্যই হবে বয়স্কদের শেখানোর উপযোগী করে শিশুদের গড়ে তোলা। যদি এ ধরণের দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের সামনে থাকে তাহলে পাঠ্যপুস্তক সহ কারিকুলামের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভিন্নতর পন্থা দরকার হবে।

কারিকুলাম উন্নয়ন ও রূপায়ণের পুরো ব্যাপারটার মধ্যে শিক্ষকই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপদান। সব কিছুই নির্ভর করছে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক কি ভূমিকা পালন করবেন তার উপরে। শিক্ষকই শিশুর অস্মিতা (personality)-কে রূপ দেবেন, তাকে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে দেবেন। শিশুর মধ্যে যেসব মূল্যবোধের বিকাশ হবে সেগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করবেন। ছোট করে বলতে গেলে শিক্ষকই কারি-কুলামের যে দর্শন (vision of the curriculum) তা শিক্ষার্থীকে জানিয়ে দেবেন। যদি শিক্ষক মহাশয় প্রতিযোগিতা, শাস্তি ইত্যাদিকে উৎসাহ দেন তাহলে শাস্তি এড়ানোটাই শিক্ষার্থীর কাছে জোরালো প্রেষণা হয়ে দাঁড়াবে। এটা লক্ষ্য করা গেছে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও বহু শিক্ষক কুসংস্কারাচ্ছন্ন। এ সমস্যার হাত এড়াবার জন্য কেউ কেউ কারিকুলামের সঙ্গে শিক্ষকদের মহাবিদ্যালয়ের যোগসূত্র স্থাপন করার কথা বলেন।

কারিকুলামকে সমাজের (comunity) সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করার কথা বলা হয়। এটা কিভাবে সম্ভব? সঙ্গতিপূর্ণ (relevant) বলতে কি বুঝাবে? উদাহরণস্বরূপ—ভারতের শহরগুলির কথা মনে রাখলে গ্রামের জন্য কোন্ কারিকুলাম সংগত হবে? কাশ্মীরের আপেল বাগিচাময় গ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে কেরালার মৎস্যজীবী গ্রামের জন্য কি রকম কারিকুলাম হবে? আধুনিক শহর বোম্বাই-এর নগরবাসীর তুলনায় মধ্যপ্রদেশের উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় কারিকুলাম কি হবে? তাহলে প্রথম কাজ হল—সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক উন্নয়নের পটভূমিকায় "কমিউনিটি"র স্বরূপ চিহ্নিত করতে হবে। তাহলে ভারতের মতো বিচিত্র দেশের জন্য একগুচ্ছ কারিকুলাম তৈরী করতে হয়। প্রাসঙ্গিক কারিকুলাম

বলতে কি আমরা এটাই বুঝাতে চাইছি ? এর অর্থ কি এটাই যে কারিকুলাম তৈরীর ব্যাপারটাকে বিকেন্দ্রীকরণ করে ফেলতে হবে ?

এ ধরণের বিকেন্দ্রীকরণের কিছু সুবিধা অবশ্য আছে—শিক্ষক, অভিভাবক, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি নানা ধরণের লোকজনের এতে অংশ নেবার সুযোগ আছে। কিন্তু আমাদের দেশে এটার অন্য সমস্যাও আছে। আমাদের দেশের তপশীল জাতি-উপজাতি, আদিবাসী, সমাজের অনগ্রসর সম্প্রদায়-এর লোকেরা জনসমষ্টির একটা প্রধান অংশ। আর এই অংশটার মধ্যে নিরক্ষরতার পরিমাণ খুবই উঁচু। এঁরা কিভাবে কারিকুলাম রচনায় সহায়তা করবেন ?

আবার শহরের কারিকুলাম কি গ্রামের থেকে ভিন্ন রকম হবে ? সেক্ষেত্রে কি দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকত্বের মত স্পর্শকাতর প্রশ্ন উত্থাপিত হবে না ? স্পষ্টতঃই গ্রামের জন্য নির্ধারিত কারিকুলামকে সহজ করতে হবে। সেক্ষেত্রে কি 'মান' (standard) রক্ষার প্রশ্ন এসে পড়বে না ? শহরের বিদ্যালয়ের ভাল ভাল উপকরণ আছে, উন্নত ল্যাবোরেটরি আছে, দৃশ্যশ্রাব্য যন্ত্র আছে—এখানে অঙ্ক, বিজ্ঞান, আধুনিক রসায়ন ইত্যাদি যেভাবে শেখানো যাবে গ্রামের সহায়সম্বলহীন বিদ্যালয়েও কি ঐভাবে পড়ানো যাবে ? অবশ্যই না। শহরের উন্নত বই, বিশেষ ধরণের উদাহরণ, একই বিষয়বস্তু গ্রামের শিশুদের কাছে আকর্ষণীয় হবে কি ? তারা কি বিদ্যালয় ছেড়ে যাবে না ? অপচয় পাহাড়প্রমাণ হয়ে উঠবে এর ফলে। মূলকথা যে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে গ্রামের শিশুরা রয়েছে তার কোনো কিছুর সঙ্গেই ঐ শহুরে কারিকুলাম সংগতিপূর্ণ বা প্রাসঙ্গিক নয়।

তাহলে আমাদের সেই 'মান' রক্ষার কি হবে ? আবার যদি গ্রামের বিদ্যালয়গুলিকেই দেশের আদর্শ বলে ধরে নেওয়া হয় তাহলে শহরে তা যত কমই হোক যে ভারতীয়রা বাস করেন—তারা কি উন্নততর 'মান'-এর কারিকুলাম থেকে বঞ্চিত হবে না ? অথচ শহরের শিশুরা উন্নত 'মান'-এর কারি-কুলাম আয়ত্ত করতে সক্ষম।

এই হল বর্তমান পরিস্থিতি—যখন আমরা কেন্দ্রীয় কারিকুলাম (Centralized Curriculum) তৈরী করছি।

কারিকুলাম নিয়ে এ হল কিছু কথা, কিছু প্রশ্ন।
কিন্তু একটা কিছু সিদ্ধান্তে আসতেই হবে।
কেননা জাতি গঠনের কাজে শিশুদের চেয়ে অমূল্য আর কিছুই নাই।

ষষ্ঠ পরিকল্পনায় শিক্ষার উদ্দেশ্য

শিক্ষা-উন্নয়নের মুখ্য উদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কে "ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৮১-৮৫ : কাঠামো"-তে নিম্নলিখিত দিকগুলির উল্লেখ করা হয়েছে—

(১) আগামী দশ বছরের মধ্যে চৌদ্দ বছর পর্যন্ত বয়সের সব ছেলেমেয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন শিক্ষা সুনিশ্চিত করা। বিশেষ কারণবশতঃ যারা অনগ্রসর তাদের প্রতি অধিকতর মনোযোগ দিতে হবে। এজন্য ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয় সংহতি, "আয়ের সঙ্গে শেখা" (Learning while Earning) এবং "মানব শ্রমের মর্যাদা" (Dignity of Human Labour)-এর মত যথাযোগ্য কার্যক্রম নিতে হবে।

(২) প্রতিটি নাগরিকের জন্য দৈনন্দিন জীবনের এবং স্থানীয় পরিবেশের উপযোগী সাক্ষরতা (literacy), সংখ্যাজ্ঞান (Numeracy), পারিপার্শ্বিক জগত সম্পর্কে মৌল উপলব্ধি, ব্যবহারিক দক্ষতা এবং প্রযুক্তিজ্ঞান (techniracy)-এর ব্যবস্থা করা।

(৩) সামাজিক দিক থেকে প্রাসঙ্গিক ক্রিয়াকলাপের বাস্তব জীবন পরিবেশের (Learning from real life situations through participation in socialy relevant activities) মধ্যে যাতে শিখন হয় এমনভাবে মাধ্যমিক এবং উচ্চতর শিক্ষার উন্নয়ন করা।

(৪) কৃষি, উদ্যোগ, বন বিজ্ঞান কেন্দ্র, বন বিদ্যাপীঠ এবং অন্যান্য কেন্দ্র যেখানে কাজের মধ্যে দিয়ে শিখন হবে—এরকম প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক প্রযুক্তি দক্ষতার ব্যবস্থা করা।

(৫) উচ্চতর শিক্ষার বর্তমান সুযোগ সুবিধাকে সদ্ব্যবহার করা, ঘরবাড়ী এবং গুণগত মানোন্নয়নের জন্য সর্বনিম্ন অতিরিক্ত সহায়-সম্পদ কাজে লাগিয়ে কার্যক্রম রচনা করা। কর্মসংস্থান বিশেষতঃ স্বনিযুক্তি এবং উন্নয়নমূলক লক্ষ্যের সঙ্গে উচ্চতর শিক্ষার সংযোগ স্থাপন করা।

(৬) কারিগরী এবং বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানের সুযোগ সুবিধা—বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পরিমাণে—সৃষ্টির উপরে গুরুত্ব আরোপ করা।

(৭) দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচীতে সুসংগঠিতভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষিত সম্প্রদায়কে দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা এবং পরিবেশের অবনতি সম্পর্কে সংবেদনশীল করে তোলা।

(৮) জাতীয় দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং সামাজিক দিক থেকে প্রাসঙ্গিক যেমন মৌল বিজ্ঞান ও মানবিক শাখার জন্য বৃত্তি, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী জনশক্তির উন্নয়ন, দুর্বলতর শ্রেণী, প্রতিবন্ধী এবং মেয়েদের জন্য উন্নয়নসূচীতে গুরুত্ব আরোপ করা।

(৯) জাতীয় উন্নয়নসূচীতে যুবশক্তির অংশগ্রহণের সুবিধা বৃদ্ধি করা।

(১০) ছাত্রাবাসগুলির অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদির এবং বই খাতা প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত দামে সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

উৎস : কারিকুলাম বুলেটিন

প্রাথমিক শিক্ষায় শ্রেণীতে আটকে না রাখার নীতি

শ্রীনিঃশঙ্ক ঘোষ

শিক্ষাক্রমে যে কোনো নির্দিষ্ট শিক্ষাস্তরের শিক্ষণীয় বিষয়ের পরিমাণ নির্ধারিত থাকে। প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের ছয় থেকে এগারো বছর বয়সী শিশুদের জন্যে নির্ধারিত পাঁচ বছরের প্রতিটি শিক্ষাবর্ষের বিষয়বস্তু স্তর এবং পরিমাণ অনুসারে বিন্যস্ত। নির্দিষ্ট শিক্ষাবর্ষে শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত বিষয়বস্তু প্রতিটি শিক্ষার্থীই শিখবে বলে আশা করা হয়। শিক্ষাবর্ষের শেষে শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব পরিমাপক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। শিক্ষার্থীকে পরবর্তী উঁচু শ্রেণীতে উন্নীত করবার জন্য তার কৃতিত্বের একটা সর্বনিম্ন মানও (যেমন শতকরা ত্রিশ নম্বর) মোটামুটি নির্ধারিত আছে। কোনো শিক্ষার্থী পরীক্ষার ফলাফলে যদি নির্দিষ্ট মানে পৌঁছতে না পারে তাহলে তাকে অনুত্তীর্ণ হয়ে একই শ্রেণীতে থেকে পুরানো পঠন কার্যক্রম অনুসরণ করতে হয়। নির্ধারিত সর্বনিম্ন মানে পৌঁছতে না পারা সত্ত্বেও কোনো শিক্ষার্থীকে যদি পরবর্তী উঁচু শ্রেণীতে তুলে দেওয়া হয় তাহলে সেই শিক্ষার্থীর শিখন-স্তরে যে শূন্যতা বা ফাঁক থেকে গিয়েছিল তার ফলে উঁচু শ্রেণীর বিষয়বস্তু কার্যকরভাবে তার পক্ষে আয়ত্ত করা সম্ভব নাও হতে পারে বলে অনুমিত হয়।

সব শিশুর শিখন-সামর্থ্য সমান থাকে না এবং গৃহেও তারা সমান ধরণের শিখন-সুযোগ পায় না। এই সব অপেক্ষাকৃত স্বল্প শিখন-সামর্থ্যের শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় পাশ করার মত সর্বনিম্ন নম্বর পায় না। কিছুকাল আগেও শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সামর্থ্য ও সুযোগ আছে সাধারণতঃ এ রকম পরিবারের শিশুরাই বিদ্যালয়ে আসত। কিন্তু তখনও যারা শিক্ষাক্রমের সঙ্গে সন্তোষজনকভাবে তাল রাখতে পারত না তারা অবরুদ্ধ হয়ে একই শ্রেণীতে থেকে যেত। শিক্ষাবর্ষ এবং শ্রেণী অনুসারে বিন্যস্ত শিক্ষাক্রম, বার্ষিক পরীক্ষা, পরীক্ষায় অসফল শিক্ষার্থীদের একই শ্রেণীতে থেকে যাওয়া—দীর্ঘকাল ধরেই প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এরকম একটা অবস্থা বিরাজমান।

বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা সার্বজনীন হতে চলেছে। বিদ্যালয়ে যেতে পারে এমন বয়সী সব

বাণীপুর স্নাতকোত্তর বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ (প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত উপাধ্যক্ষ—পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিক্ষা সংস্থা) শ্রীনিঃশঙ্ক ঘোষ মহাশয়ের "PRINCIPLE OF NON-DETENTION IN PRIMARY EDUCATION" প্রবন্ধের অনুবাদ।

ভাষান্তর : শ্রীআলোক মাইতি
শ্রীমতী কৃষ্ণা বসু

শিশুরাই যাতে একটি সর্বনিম্ন সময়ের জন্য (আপাততঃ ৬-১১ বছর পর্যন্ত) বিদ্যালয়ে থাকে এটা দেখা হচ্ছে। এরকম পরিস্থিতিতে পূর্বের তুলনায় একটা বিরাট সংখ্যক স্বল্প-শিখন সামর্থ্যের শিশুরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবে। বহু শিশুরাই দরিদ্র ও নিরক্ষর পরিবার থেকে আসবে যারা বাড়ীতে সকল রকম শিখন-সহায়ক সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এর ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্বল্প-শিখন সামর্থ্যযুক্ত শিশুদের সংখ্যা আরও বেড়ে যাবার সম্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে একটি শ্রেণীতে বহু সংখ্যক শিক্ষার্থীর পরীক্ষায় অসাফল্য ঘটবে এবং ফলশ্রুতিস্বরূপ অবরোধ হবে।

শ্রেণীতে বার্ষিক পরীক্ষায় অসাফল্যের জন্যে অবরোধের ফলে কতকগুলি বিশেষ ধরণের সমস্যা দেখা দেয়। যে শিশুরা পরীক্ষায় অসাফল্যের জন্য একই শ্রেণীতে থেকে যায় তারা পুরানো পড়াই অনুসরণ করে— যা তাদের কাছে খুব কমই আকর্ষণীয় বলে মনে হয়। শুধু তাই নয় এটা এক ধরণের শ্রম ও সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা দেখা গেছে, অসফল শিক্ষার্থীদের একই শ্রেণীতে আটকে না রেখে পরবর্তী শ্রেণীতে উন্নীত করলে তারা অপেক্ষাকৃত ভাল ফলাফল দেখায়। এও লক্ষ্য করা গেছে, অসফল শিক্ষার্থীরা তাদের তুলনায় বয়সে ছোট অথচ শিখনের দিক থেকে অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন শিশুদের সঙ্গে সহজভাবে খাপ খাওয়াতে পারে না। এ ধরণের অসুবিধা অবশ্য বছরের শেষ দিকে কিছুটা কমে যেতে পারে। কিন্তু যে সব শিক্ষার্থী একই শ্রেণীতে একাধিক বার থেকে যায় তাদের ক্ষেত্রে ভিন্ন কথা। এ ধরণের শিক্ষার্থীরা সাধারণতঃ বছরের মাঝামাঝি সময়ে বিদ্যালয় ছেড়ে যেতে থাকে। ফলে এক বিরাট সংখ্যক শিশুর শিক্ষা থেকে যায় অসম্পূর্ণ এবং প্রকৃতপক্ষে তারা নিরক্ষরদের দলই ভারী করে। এটাও আর এক ধরণের শ্রম, অর্থ ও সময়ের অপচয়। বস্তুতঃপক্ষে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অবরোধ এবং অপচয় এমনই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা যা আদৌ কালবিলম্ব না করে সমাধান করা উচিত।

অবরোধ সমস্যার সমাধান করতে হলে এর পশ্চাদ্‌বর্ত্তী কারণগুলো পরীক্ষা করে দেখা দরকার। সমস্যাটিকে যথাযথ পটভূমিকায় দেখতে হলে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও প্রকৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

সামাজিক জীবন-যাপনের জন্য প্রতিটি ব্যক্তির সর্বনিম্ন এবং সাধারণ ধরণের যেটুকু শিক্ষা প্রয়োজন তাই প্রাথমিক শিক্ষার অন্তর্ভূত। দেহমনের সুষম বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক জীবন-যাপনের জন্য যে সব মৌল জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োজন প্রাথমিক শিক্ষার ফলে সেগুলি শিশুর মধ্যে বিকশিত হয়ে উঠবে। এসব কথা স্মরণে রেখেই শিক্ষাক্রম সংগঠিত হওয়া দরকার। শিশুর বিকাশ স্তর এবং চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখেই শিখন কার্যক্রম ঠিক হবে। শিখন সামর্থ্যের দিক থেকে শিশুদের মধ্যে পার্থক্য আছে। সুতরাং নিম্ন, মধ্য ও উঁচু সামর্থ্যের শিশুদের জন্য শিক্ষাক্রমে সন্তোষজনক স্তর ও কার্যক্রম থাকা দরকার। এ ধরণের শিক্ষাক্রমে শিখন-স্তর অনুসারে শিক্ষণীয় বিষয়ের পরিমাণ ও বিস্তৃতিরও পার্থক্য থাকবে। এর ফলে ভিন্ন ভিন্ন শিখন-সামর্থ্যের শিশুরা তাদের জীবন-যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে পারবে। এ ধরণের শিক্ষাক্রম অবশ্যই নিছক পুঁথিসর্বস্ব এবং তাত্ত্বিক হবে

না। যতদূর সম্ভব বাস্তব জীবন পরিবেশের সঙ্গে সাঙ্গীকৃত করে বিষয়বস্তু সংগঠিত হবে। তা না হলে শিশুদের কাছে শিক্ষাক্রম আকর্ষণীয় ও উপযোগী হবে না। ফলে অসফল শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়বে এবং অবরোধ ঘটতে থাকবে।

শিক্ষা পদ্ধতিও চিত্তাকর্ষক হওয়া উচিত। শিখন হবে ধারাবাহিক এবং কোনো স্তরেই কোনোরূপ শিখন শূন্যতা বা বিচ্ছিন্নতার সুযোগ থাকবে না। পূর্ববর্তী স্তর যথাযথ দক্ষতার সঙ্গে আয়ত্ত না করে পরবর্তী শিক্ষাস্তরে কোনোভাবেই যাওয়া যাবে না। এ ধরণের শিক্ষাক্রমের মধ্যে শিক্ষার্থীরা আনন্দের সঙ্গে কাজ করবার যথেষ্ট সুযোগ ও উৎসাহ পাবে। ফলে শিখনের সঙ্গে সঙ্গে সফলতার অনুভূতিও তাদের হবে।

যদি একই শিক্ষাক্রম শ্রেণীর সকল ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা অনুসৃত হয় তাহলেও শিক্ষার্থীদের সাফল্যের স্তরভেদ থাকবে।

সুতরাং শিক্ষা পদ্ধতিতেও আংশিক বা পুরোপুরি ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য আনতে হবে। বর্তমানের শ্রেণী শিক্ষা পদ্ধতিতে সমস্ত শিশুর জন্য একই ধরণের বিষয়বস্তু উপস্থাপিত হয়ে থাকে এবং ধরে নেওয়া হয় সকল ছাত্র-ছাত্রী একই গতিতে বিষয়বস্তু আয়ত্ত ও উপলব্ধি করতে সমর্থ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শিশুরা তা পারে না। শ্রেণীতে মাঝামাঝি শিখন সামর্থ্যের ছাত্র-ছাত্রীদের দিকে লক্ষ্য রেখেই শিক্ষাপদ্ধতি অনুসৃত হয়। এতে অপেক্ষাকৃত ধীরগতিসম্পন্ন শিখন সামর্থ্যের শিশুরা পিছিয়ে পড়ে। আবার অন্যদিকে দ্রুতগতিসম্পন্ন শিখন সামর্থ্যের শিশুরা অন্যদের থেকে এগিয়ে থাকে বলে তারা অধৈর্য্য হয়ে পড়ে এবং শ্রেণীর পঠন-পাঠনে আগ্রহ বোধ করে না। যথাযথ উদ্দীপনা ও আকর্ষণ সৃষ্টিকারী শিক্ষা পদ্ধতির অনুপস্থিতিতে ধীরগতিসম্পন্ন শিখন সামর্থ্যের শিশুরা ক্রমেই পিছিয়ে পড়তে থাকে এবং তার ফলস্বরূপ অবরোধ বেড়েই চলে।

গৃহ পরিবেশকে শিক্ষার একটা দিক হিসাবে দেখা হয়। এটা শিখনেরও একটা প্রধান উপাদান। যেসব শিশুরা বিদ্যালয়ে আসে তাদের অনেকের গৃহ পরিবেশই দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতায় পূর্ণ। এসব গৃহের শিশুরা উপযুক্ত খাবার, পোষাক-পরিচ্ছদ এবং শিখনের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা ও অবকাশ পায় না। এরকম অভিভাবকেরা প্রায়ই শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজন উপলব্ধি করেন না এবং শিশুকেও শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করে তুলতে পারেন না। এর ফলে বহু শিশুই নিয়মিত বিদ্যালয়ে যায় না এবং যথাযথ-ভাবে গৃহকাজ করে আনে না। এসব বাড়ীর শিশুরা শ্রেণীর অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে না এবং পঠন-পাঠনের বহু বিষয় শিখতে পারে না। শ্রেণীর সঙ্গে একই তালে অগ্রগতি তাদের পক্ষে বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। ফলে শিক্ষাগত দিক থেকে তারা পিছিয়ে পড়ে। এর ফলে শিশুদের স্নায়ুর ওপরে যে চাপ পড়ে তার ফলে হয় তারা বিদ্যালয় ছেড়ে যায় না হয় অবরোধ ঘটে। যতক্ষণ না গৃহ পরিবেশের এই ধরণের সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রতিকূল অবস্থা আরও উন্নত করা সম্ভব হচ্ছে ততক্ষণ

এসব পিছিয়ে পড়া শিশুদের তাদের নিজ নিজ সামর্থ্য ও গতিতে শিখনের সুযোগ দেওয়াই সংগত।

কেবলমাত্র একটা উন্নত শিক্ষাক্রম এবং শিক্ষাপদ্ধতি ভালো পরিবার থেকে আসা শিশুদেরও সুশিখন নিশ্চিত করে না। এমন অনেক ছোটখাট ব্যাপার আছে যেগুলি প্রতিকূল হলেও কার্যকরী শিখন বিঘ্নিত হয়। এ সবের গভীরে না গিয়ে শিক্ষার্থীদের সাফল্যের পরিমাপ এবং তাদের অকৃতকার্যতার কারণগুলি যথাযথ সময়ে নির্ধারণ করা একান্ত আবশ্যক। এটা করা হলে গোড়াতেই শিশুদের দুর্বলতা এবং অসম্পূর্ণতার কারণ খুঁজে বের করা সম্ভব হবে। যার ফলে সময় নষ্ট না করে তাদের শিখনে সহায়তা করা যাবে। কিন্তু বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থার অভীক্ষাগুলি মূলতঃ নির্বাচনধর্মী, নির্ণয়াত্মক নয়। বিভিন্ন শিখন সামর্থ্যের শিশুদের সাফল্যের পরিমাপ এবং প্রয়োজন মতো নির্দেশনার জন্য অভীক্ষাগুলিকে বারবার ব্যবহারের সুযোগ নাই। বর্তমানের পরীক্ষাগুলি কেবলমাত্র শিক্ষার্থীর কৃতিত্বের পরিমাপক। সাধারণতঃ যেসব ছাত্রছাত্রী কমপক্ষে শতকরা ৩০নং পায় তাদের পরবর্তী শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়। এর অর্থ হল তারা শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত শিক্ষাক্রমের কেববমাত্র এক তৃতীয়াংশ আয়ত্ত করতে পেরেছে। স্পষ্টতঃই দেখা যাচ্ছে, শিক্ষার্থীর এই কৃতিত্বের মধ্যেও একটা বিরাট শিখন-অসম্পূর্ণতা থেকে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও এই শিখন-অসম্পূর্ণতা তাদের মধ্যে বেড়েই চলতে থাকবে। ফলে শিশুরা আত্মবিশ্বাস হারায়, পঠন-পাঠনে আকর্ষণ বোধ করে না এবং পিছিয়ে পড়তে থাকে। এইসব শিক্ষার্থীরা কার্যতঃ অসফল শিক্ষার্থীদের দল ভারী করে এবং একই শ্রেণীতে থেকে যায়। সুতরাং একদিক থেকে দেখতে গেলে বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীর শিখন-অসম্পূর্ণতা বাড়িয়ে তুলে অববোধের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

আমরা প্রাথমিক শিক্ষার চারটি প্রধান দিক—শিক্ষাক্রম, শিক্ষাপদ্ধতি, গৃহপরিবেশ এবং পরীক্ষা ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেছি। উল্লিখিত দিকগুলি এবং ব্যক্তিপার্থক্যকেই অপচয় এবং অবরোধের প্রধান কারণরূপে দেখা যেতে পারে। এগুলির কিরূপ প্রয়োজনানুগ সংস্কার করলে পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে শিক্ষার্থীর শিখন বাধাহীন এবং ধারাবাহিক হতে পারে তাও আমরা ইঙ্গিত করেছি। পশ্চিমবঙ্গ নয়া শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীতেও এটা চাওয়া হয়েছে এবং চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত কোনো শিক্ষার্থীকে কোনো শ্রেণীতেই আটকে না রাখার কথা বলা হয়েছে। দরকার হলে কোনো শিক্ষার্থীকে পঞ্চম শ্রেণীতে অতিরিক্ত একবছর পঠন-পাঠনের সুযোগ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের শেষে কোন আবশ্যিক বহিঃ পরীক্ষা নেই এবং নূতন শিক্ষাক্রমেও ওই ধরণের বহিঃ পরীক্ষারও কোন নির্দেশ নাই। আভ্যন্তরীণ বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বিদ্যালয় পরিত্যাগের অভিজ্ঞানপত্র দেওয়া হয়। এইসব পরীক্ষাগুলি পরবর্তী শ্রেণীতে উন্নীত হবার বা না হবারও ভিত্তি। বর্তমানে শ্রেণীতে আটকে না রাখার নীতি গৃহীত হবার ফলে পরবর্তী শ্রেণীতে উন্নীত করার জন্য এই সব বার্ষিক পরীক্ষার তেমন কোন প্রয়োজন আর থাকছে না। অন্যভাবে বলতে গেলে এই সব বার্ষিক পরীক্ষা থাকলেও শ্রেণীতে আটকে রাখা বা না রাখার ব্যাপারে এদের কোন গুরুত্ব

থাকছে না। বৃটিশ আমলে আমাদের দেশের শিক্ষাজগৎ খুব বেশী পরিমাণেই পরীক্ষা নির্ভর ছিল। সেই একই ধারা এখনও চলার ফলে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক সকলেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বা অনুত্তীর্ণ হওয়াকেই শিক্ষার মূল লক্ষ্য বলে মনে করছেন। কিন্তু বর্তমানে এ ধরণের পরীক্ষার আর কোনো প্রয়োজন থাকছে না। এ ধারণা অনেকের কাছে বাস্তবিকই বিভ্রান্তিকর বলে মনে হচ্ছে। নয়া পরিস্থিতির বিস্তারিত পর্যালোচনা করে এ সংশয় অপনোদন করা যায়।

শিক্ষার অন্যান্য ক্ষেত্রে কতকগুলি প্রয়োজনীয় পরিবর্তন না এনে, শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের সাফল্যের মাত্রা বিবেচনা না করে নিছক যান্ত্রিকভাবে শ্রেণীতে আটকে না রাখার নীতি অনুসৃত হলে তা চরম ক্ষতিকারক হতে পারে। যদি শিক্ষাক্রমকে অনমনীয়ভাবে লম্ব ও সমান্তরাল দিক থেকে সংগঠিত করা হয়, যদি শিখন সামর্থ্যের ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিপার্থক্যের কথা মনে না রেখে শিক্ষাপদ্ধতি নির্বাচন করা হয় এবং যদি কেবলমাত্র পরীক্ষার সাহায্যেই শিক্ষার্থীর কৃতিত্বের পরিমাপ করা হয় তাহলে বিভিন্ন শ্রেণীতে খুব বেশী পরিমাণে অবরোধ ঘটতে থাকবে। আর এর ফলে অবরোধ বৃদ্ধির ফলশ্রুতিস্বরূপ অপচয় আশঙ্কাজনকরূপে বেড়ে যাবে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের এগারো-বারো বছর বয়স পর্যন্ত ধরে রাখা এবং পরবর্তী উঁচু শ্রেণীতে পর পর উন্নীত করে দেওয়াটাই শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য নয়। বরং শিক্ষার্থীরা পাঁচ-ছয় বছরের জন্য বিদ্যালয়ে সক্রিয়ভাবে পঠন-পাঠনের কাজে নিযুক্ত থেকেই কমবেশী সন্তোষজনক ভাবে নির্ধারিত বিষয়গুলি আয়ত্ত করবার পরই বিদ্যালয় ত্যাগ করবে—এটাই শিক্ষাক্রমের মধ্যে চাওয়া হয়।

শিক্ষাক্রমের উল্লিখিতরূপ উদ্দেশ্যকে সফল করে তোলার জন্য শ্রেণীতে আটকে না রাখার নীতি বা অবরোধহীনতা তত্ত্বের যৌক্তিক ফলশ্রুতিস্বরূপ আনুষঙ্গিক কতগুলি দিক পরীক্ষা করে দেখা এবং যথাযথ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া দরকার। যদি শিক্ষার সর্বস্তরে যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় এবং শ্রেণীতে শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত পাঠ্যক্রম সফলতার সঙ্গে সম্পূর্ণ করতে পারবে এ বিষয়ে সুনিশ্চিত হওয়া যায় তাহলে অবরোধ কোনো সমস্যারূপে দেখা দেবে না।

কিন্তু শিশুদের শিখন সামর্থ্য এবং পারিবারিক পরিবেশের ভিন্নতার কথা বিবেচনা করলে এটা সহজে সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। একটা বিকল্প হল—শিক্ষাক্রমকে এমনভাবে সংগঠিত করা যাতে করে খুব ধীরগতিসম্পন্ন শিখন সামর্থ্যের শিশুরাও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শিক্ষাক্রম আয়ত্ত করতে পারে। কিন্তু আজকের দিনে জীবনযাপন প্রণালী এতই জটিল যে শিক্ষাক্রমের খুব বেশী সরলীকরণ শিক্ষাক্রমের মূল উদ্দেশ্যকেই ব্যাহত করবে বুদ্ধিমান শিশুদের কথা ছেড়ে দিলেও সাধারণ শিখন সামর্থ্যের সংখ্যা গুরু মাঝারী দলের শিক্ষার্থীর দিক থেকেও এ ধরণের ব্যবস্থা অনুপযুক্ত। বাস্তব দিক থেকে দেখতে গেলে মাঝারী দলের শিশুদের চাহিদা এবং সামর্থ্য উপযোগী শিক্ষাক্রম রচিত হওয়া উচিত। যথাযথভাবে শিক্ষোপকরণের বিন্যাসের সাহায্যে শিক্ষাক্রমকে এরূপভাবে নমনীয় করা দরকার যাতে ধীর এবং দ্রুতগতি উভয় শিখন সামর্থ্যসম্পন্ন শিক্ষার্থীরাও যথাযথভাবে শিক্ষাক্রমকে অনুসরণ করতে

পারে। অবশ্য বাস্তবিকভাবে ধীর ও দ্রুতগতিসম্পন্ন শিখন সামর্থ্যের শিশুদের উপযোগী যথেষ্ট পরিমাণ শিক্ষোপকরণ অদূর ভবিষ্যতে শ্রেণীতে দেওয়া সম্ভব হবে না। বর্তমানে সব শিক্ষার্থীদের জন্যেই একই শিক্ষাক্রম প্রযোজ্য। ফলে শিক্ষার্থীদের প্রগতি অসম হচ্ছে। এমনভাবে স্তর অনুযায়ী বিষয় বিন্যাস হওয়া দরকার যাতে শিক্ষার্থীদের কোনোরূপ শিখন অসম্পূর্ণতা না থাকে এবং তাদের ধারাবাহিক শিখন সম্ভব হয়। **সুতরাং প্রতিটি শিক্ষার্থীর স্ব-সামর্থ্যানুযায়ী ক্রম অনুসারে বিন্যস্ত বিষয় ধারাবাহিক শিখনের নীতিই অবরোধহীনতা তত্ত্ব বা শ্রেণীতে আটকে না রাখা নীতির প্রথম অনুসিদ্ধান্ত।**

শিক্ষাবর্ষের শেষ নাগাদ মাঝারী সামর্থ্যের শিক্ষার্থীরা (এরাই শতকরা সত্তর ভাগ) মোটামুটি সন্তোষজনকভাবে পাঠ্যক্রম আয়ত্ত করতে পারে। ধীরগতি শিখন সামর্থ্যের শিক্ষার্থীরা শিখন-সিঁড়ির বিভিন্ন ধাপে দাঁড়িয়ে থাকে। অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিসম্পন্ন শিখন সামর্থ্যের শিক্ষার্থীরা কয়েক মাস আগেই পাঠ্যক্রম হয়ত শেষ করে ফেলতে পারে। এসব শিক্ষার্থীদের হয় শ্রেণীর তুলনায় অপেক্ষাকৃত উন্নততর পাঠ দিতে হবে নতুবা তারা পুরানো পাঠই ঝালাই পাঠ হিসাবে শিখতে থাকবে। পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের সুরু থেকেই শ্রেণীর সকল ছাত্রছাত্রীকেই পরবর্তী উঁচু শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত একই শিক্ষা কার্যক্রম অনুসরণ করতে হবে। সুরু থেকেই পিছিয়ে পড়া শিশুদের শিখনের মধ্যে পূর্ববর্তী বছরের শিখন অসম্পূর্ণতা থেকেই যায়। এটা একেবারেই কাম্য নয়। পরবর্তী শ্রেণীতে উন্নীত করে দেওয়া হলেও ধারাবাহিক শিখনের দিক থেকে ভাবলে এই সব শিক্ষার্থীদের তাদের অসম্পূর্ণ পাঠ সমাপ্ত করতে দেওয়া উচিত। যেসব শিক্ষার্থীরা অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি শিখতে পারে তারা নতুন বছরে তাদের পূর্বের আয়ত্ত করা শিক্ষাসূচী অনুসরণ করতে পারে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে একই শ্রেণীতে তিন ধরণের শিখন সামর্থ্যের শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক পৃথক কার্যক্রম থাকবে যার সঙ্গে আমাদের খুব বেশী পরিচয় নেই। এর ফলে বর্তমানের শিক্ষাক্রমের যে ক্রম কঠিন বিভাজন আছে তা দূরীভূত হতে পারে। বর্তমানের ক্রমবিন্যস্ত শিক্ষাক্রমে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর মধ্যে একই শ্রেণীতে বিভিন্ন শিখন সামর্থ্যের শিশুদের সহবস্থানের কথা বোঝা যায় না। প্রাথমিক স্তরে শ্রেণী বলতে বোঝায় একটি শিশু কত বছর বিদ্যালয়ে আছে। চতুর্থ শ্রেণীর শেষে একটি ছাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য নির্ধারিত সম্পূর্ণ শিক্ষাক্রম সমাপ্ত করতে পারে বা অর্ধপথেও থাকতে পারে। সুতরাং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শিক্ষার দিক থেকে দেখলে শ্রেণীবিন্যাসের খুব কমই শিক্ষাগত গুরুত্ব আছে। **পাঠ্য বিষয়ের দিক থেকে যে পাঁচটি উলম্ব বিভাগ তার সঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঁচটি বাৎসরিক স্থিতি—এই দুটির সম্পর্কহীনতা—এটাই হল শ্রেণীতে আটকে না রাখা নীতির দ্বিতীয় অনুসিদ্ধান্ত।**

উল্লিখিত নীতি অনুসারে নিম্নানুরূপে শিক্ষাক্রম সংগঠন করা যায়। যে কোনো বিষয়েই প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ক্রমবিন্যস্ত পাঠ একক সমূহকে একটি মাত্র ধারাবাহিক সংগঠিত বিষয় হিসাবে সামগ্রিকভাবে উপস্থাপিত করতে হবে। নতুন শিক্ষাক্রমে যেভাবে পাঁচটি বিস্তৃত স্তর বিভাজন রয়েছে তাও থাকতে পারে। মাঝারী শিখন সামর্থ্যের শিক্ষার্থীদের দিক থেকে যে ধরণের সাফল্য আশা করা

যায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে একটি স্তরের বিষয়ের পরিমাণ এবং শিখনস্তর নির্ধারিত হবে। এক একটি স্তরের বিষয়গুলিকে ৮ থেকে ১০টি পাঠ এককে বিন্যস্ত করা যেতে পারে। তবেই শিশুরা নিজ নিজ শিখন সামর্থ্য অনুসারে নিরবচ্ছিন্নভাবে শিখন স্তর অতিক্রমে সক্ষম হবে। কোনো শিক্ষার্থীর বিভিন্ন বিষয়ের শিখন অগ্রগতি বিভিন্ন স্তরে থাকতে পারে। কোনো শিক্ষার্থীর এক বিষয়ে অগ্রগতি শ্রেণীর গড় অগ্রগতির নীচেও থাকতে পারে আবার অন্য বিষয়ের উপরেও থাকতে পারে। স্বাভাবিকভাবে এ সন্দেহ দেখা দিতে পারে যে এই ব্যবস্থার ফলে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঁচ বা ছয় বৎসর থাকার সময়ের মধ্যে আদৌ প্রাথমিক শিক্ষাক্রম শেষ করতে পারবে কিনা।

শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক শিখন তার আত্মবিশ্বাসের ভিত্তিকেই দৃঢ় করবে। পরীক্ষায় অসাফল্য এবং ভালো ছেলেদের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতা না থাকার ফলে শিক্ষার্থীর মানসিক চাপ কম হবে। ফলে সে আরও দ্রুততা এবং আনন্দের সঙ্গে শিখবে। শিখনের সফলতার অনুভূতি শিক্ষার্থীর নিজের মধ্যে জোরালো প্রেষণার সঞ্চার করে এবং তাকে আরও এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। সুতরাং এটা আশা করা যায় বিদ্যালয় ত্যাগের আগে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরাও শিখনের ক্ষেত্রে অধিকতর উৎসাহ পাবে এবং সন্তোষজনকভাবেই শিক্ষাক্রম কমবেশী সম্পূর্ণ করবে। অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান শিশুরা অবশ্য নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগে শিক্ষাক্রম সমাপ্ত করতে পারবে। এই ধরণের শিক্ষার্থীদের প্রাথমিকোত্তর স্তরের কিছু কিছু বিষয় সুবিধা মতো শেখার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে।

শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা মোটামুটি একই তালে শিখতে পারে এরকম অনুমান থেকেই মাঝারী শিক্ষার্থীদের দিকে লক্ষ্য রেখে শ্রেণী পাঠনা পরিচালিত হয়। শ্রেণীর সব শিক্ষার্থীদের জন্য একই ধরণের বিষয়বস্তু উপস্থাপিত করা হয়। শ্রেণী পাঠনা—শিক্ষা পদ্ধতির দিক থেকে স্বল্প সময় সাপেক্ষ বলে সুবিধাজনক হলেও এতে ধীর এবং দ্রুতগতিসম্পন্ন উভয় ধরণের শিখন সামর্থ্যের শিশুরাই অবহেলিত হয়। কিন্তু নতুন ধরণের শ্রেণী পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীর সাফল্যের স্তর বিভিন্ন ধরণের হয়। এদের মধ্যে একদল শিশু যেমন অনেক পিছিয়ে থাকে তেমনি বেশ কিছু সংখ্যক শিশু শ্রেণীর নির্ধারিত শিখন স্তর অপেক্ষা এগিয়ে থাকে। শিক্ষার্থীদের শিখন প্রগতি বিভিন্ন ধরণের হয়। স্বাভাবিক কারণেই শিখন উপাদানগুলিও ভিন্ন ভিন্ন ধরণের হতে হবে। সুতরাং শিক্ষাগত অগ্রগতির দিক থেকে যখন একই শ্রেণীতে ভিন্নধর্মী শিক্ষার্থীদের নিয়ে শ্রেণী সংগঠন করা হয় তখন প্রচলিত ধরণের শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষা দান সম্ভব নয় বলে শিক্ষা পদ্ধতি প্রয়োজন মত ব্যক্তিমুখী হবে। **সুতরাং শিক্ষাপদ্ধতি ব্যক্তিমুখী করাকে শ্রেণীতে আটকে না রাখা নীতির তৃতীয় অনুসিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করতে হবে।**

শিক্ষকরা অবশ্যই বলতে পারেন, বর্তমানে যেভাবে এক একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষক-ছাত্রের হার রয়েছে তাতে ব্যক্তিমুখী শিক্ষাদান-পদ্ধতি অনুসরণ করা সম্ভব নয়। শ্রেণী শিক্ষাদান-পদ্ধতিতে শ্রেণীর সব ছাত্রছাত্রীকেই একটি নির্দিষ্ট সময়ে একই ধরণের বিষয় শেখানোর প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু এই

পদ্ধতিতে সকল শিক্ষার্থীরা প্রকৃতই কি উপকৃত হয়? শিক্ষক মহাশয় নিজেও কি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে সব ছাত্রছাত্রীই তাঁর পাঠদান সত্যিই উপলব্ধি করতে পারছে? কিম্বা যে সব শিক্ষার্থীরা তাঁর পাঠদান উপলব্ধি করতে পারছে না, শিক্ষক মহাশয় কি তাদের যথাযথভাবে ব্যক্তিগত সাহায্য দিতে পারছেন? শিশুরা যখন শেখে তখন কি তিনি তাদের যথাযথ নির্দেশনা দিতে পারেন? শিক্ষক মহাশয়ের পক্ষে কি ছাত্রছাত্রীদের গৃহকাজ নিয়মিতভাবে দেখে দেওয়া সম্ভব? এই সব প্রশ্নের উত্তর নেতিবাচক হলে শিক্ষক শ্রেণী-শিক্ষাদানে সফল হয়েছেন এ কথা বলা যায় না। বহু ছাত্রই অসহায়ভাবে পিছিয়ে পড়তে থাকে। অন্যদিকে বেশ কিছু সংখ্যক বুদ্ধিমান ছেলে অলসভাবে শ্রেণীতে বসে থাকে এবং এর ফলে এই উভয় ধরণের শিক্ষার্থীরাই গুরুতর ধরণের শ্রেণী-শৃঙ্খলা সমস্যার সৃষ্টি করে। সুতরাং বড় বড় শ্রেণীর ক্ষেত্রে শ্রেণী শিক্ষণ পদ্ধতি কার্যকরী শিক্ষা দানের নিশ্চয়তা নয়। যেভাবেই হোক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যথা-যোগ্য শিক্ষক-ছাত্রের হারের লক্ষ্যে পৌঁছানো উচিত। এখন প্রশ্ন হল, শ্রেণী শিক্ষণের তুলনায় ব্যক্তি-মুখী শিক্ষাদান পদ্ধতির ক্ষেত্রে কি শিক্ষার্থীর সংখ্যা কম হওয়া উচিত? আপাতদৃষ্টিতে এর উত্তর ইতিবাচক। কিন্তু শিক্ষাদান পদ্ধতির প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের দ্বারা একজন শিক্ষকেব পক্ষে বহুসংখ্যক ছাত্রকে ব্যক্তিগতভাবে শেখানো সম্ভব। যদি শিখন ধারাবাহিক হয়, শিখন স্তরগুলি সুবিন্যস্ত হয়, শিখন উপাদানগুলি স্বশিখনের উপযোগী হয় তবে শিখন-ভিত্তি ভালো রকম হয়েছে—এই রকম শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষকের সহায়তা খুব কমই প্রয়াজন হবে। যেহেতু এ ধরণের শিক্ষার্থীদের আগে থেকেই শিখন প্রেষণা বেশ ভালো রকম হয়েছে, সুতরাং তারা নিজ নিজ সামর্থ্য মতো আনন্দের সঙ্গে শিখবে এবং সফলতার দিকে এগিয়ে যাবে। এই ধরণের শিক্ষার্থীরা কেবলমাত্র তখনই শিক্ষকের কাছে সাহায্যের জন্য আসবে যখন পুনঃ পুনঃ সব রকম প্রয়াস সত্ত্বেও তারা কোনো বিষয় শিখতে পারছে না। বহুক্ষেত্রেই সামান্য একটি ইঙ্গিতসূত্রের সাহায্যেই শিক্ষার্থীর শিখন প্রক্রিয়াকে যথাযথ পথে শিক্ষক মহাশয় পরিচালিত করতে সক্ষম হবেন। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে স্বশিখনের নীতি অনুসৃত হতে পারে। শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের কাছে না এসেও সক্রিয়ভাবে শিখছে, এ ধরণের ব্যবস্থা একেবারেই অসম্ভব নয়। শিক্ষার্থীর কার্যকরী শিখনের পথে বাধাসৃষ্টি না করেও শিক্ষক মহাশয় এই ধরণের শিক্ষাপদ্ধতিতে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে স্বল্প সময় ও মনোযোগের দ্বারা সাহায্য করতে পারেন।

শ্রেণীতে শিক্ষার্থীরা যখন কাজ করছে তখন পিছিয়ে পড়া এবং কিছুটা এগিয়ে থাকা ছাত্রদের একই সঙ্গে শেখানো সুবিধাজনক হতে পারে। অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া শিশুরা তাদের সঙ্গী অপেক্ষাকৃত এগিয়ে থাকা শিশুদের কাছ থেকে কিছুটা সাহায্য পেতে পারে। এর ফলে শিখনের ক্ষেত্রে উভয় দলই উপকৃত হবে এবং শিক্ষক মহাশয়ের সময়ও কিছুটা বেঁচে যাবে। শ্রেণীতে পরস্পর প্রতিযোগিতাধর্মী এই ধরণের তিন-চারটি দল তৈরী করা যেতে পারে। প্রতিটি দলের আলাদা আলাদা দলনেতা থাকবে। প্রতিটি পর্ব ও বছরের শেষে এই সব দলগুলির অগ্রগতির পারস্পরিক তুলনা করে দেখা যেতে পারে। অপেক্ষাকৃত অধিক কৃতিত্বের অধিকারী দলকে যথাযথ স্বীকৃতি জানানোও যেতে

পারে। এই ধরণের দলগত শিক্ষার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা এবং সহযোগিতামূলক মনোভাবের বৃদ্ধি ঘটবে। যেসব শিক্ষার্থী মোটামুটি একই রকম যোগ্যতার অধিকারী তাদের নতুন পাঠ-দানের সময় দলগতভাবে শেখানো খুবই সম্ভব। শ্রেণীর অন্যান্য শিক্ষার্থীরা যখন স্বাভাবিকভাবে শিখনের কাজে ব্যস্ত থাকবে তখন শিক্ষক মহাশয় এই দলটিকে আলাদা করে নিয়েও শেখাতে পারেন। এ ধরণের কিছুটা সংশোধিত শ্রেণী-শিখনপদ্ধতি অবলম্বন করে শিক্ষক মহাশয় বেশ কিছুটা সময়ও বাঁচাতে পারবেন। আবার শ্রেণীতে বেশ কিছু সংখ্যক অতি ধীরগতি শিখন সামর্থ্যের শিক্ষার্থী থাকতে পারে (ধরা যাক ৫/৬ জন) যাদের জন্য শিক্ষকের কিছুটা ব্যক্তিগত এবং একক মনোভাবের প্রয়োজন হতে পারে। কেননা এ ধরণের শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ধরণের সংশোধনাত্মক শিখনপদ্ধতির প্রয়োজন। **সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শ্রেণীতে আটকে না রাখা রীতির নতুন অনুসিদ্ধান্ত হল সহযোগিতাধর্মী স্ব-শিখন পদ্ধতি।**

এই প্রণালীকে কার্যকরী করার জন্য শিক্ষক মহাশয়কে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে ব্যক্তিগত এবং ঘনিষ্ঠ-ভাবে জানতে হবে। শিক্ষার্থী শিখনের সময় পূর্বে কি ধরণের অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে এবং কিভাবে তার সমাধান করেছে এ বিষয়েও শিক্ষক মহাশয় অবহিত হবেন। শিখনের দিক থেকে শিক্ষার্থীর শক্তি এবং দুর্বলতা কোথায় সামাজিক প্রাক্ষোভিক সংগতি এবং তার গৃহ-পরিবেশ সম্বন্ধে ও শিক্ষক মহাশয়ের ধারণা থাকা প্রয়োজন। দ্রুত ও কার্যকরী শিখন-নির্দেশনা এবং এটি নির্ধারণের জন্য এগুলির প্রয়োজন আছে। এই ধরণের শিক্ষা পদ্ধতিকে কার্যকরী করার জন্য একই শিক্ষকের কাছে পরবর্তী বছরগুলিতেও আগের শিক্ষার্থীর দল যাতে থাকে সেটা দেখা দরকার। অর্থাৎ যিনি এক বছর প্রথম শ্রেণীর শ্রেণী শিক্ষক তিনি পরবর্তী বছরে দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রেণী-শিক্ষক হবেন। যদি একই শিক্ষক একটি শ্রেণীর সকল বিষয়ের পাঠদান করেন তাহলে আরও সুবিধা হতে পারে। এর ফলে শিক্ষক-ছাত্র সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠ ও দৃঢ় হতে পারে। বিভিন্ন বিষয়ে কোনো শিক্ষার্থীর সাফল্যের খুব বেশী তারতম্য হতে থাকলে শিক্ষক মহাশয় এমনভাবে তাঁর পাঠদান পদ্ধতিকে পরিচালিত করতে পারেন যার ফলে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন বিষয়ের সাফল্য একই ধরণের হতে পারে। শিক্ষা তত্ত্বের দিক থেকে প্রাথমিক শিক্ষায় বিষয়বস্তুর খুব বেশী পৃথকীকরণ এবং বিশেষীকরণ কাম্য নয়। যতদূর সম্ভব সাঙ্গীকৃত আকারেই বিভিন্ন বিষয়ের বিষয়বস্তুকে প্রকল্প বা সাধারণ পাঠের মধ্যে উপস্থাপিত করা ভালো। নানা কারণেই প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রমকে সম্পূর্ণ সাঙ্গীকৃত রূপের সংগঠন করা সম্ভব নয়। কিন্তু শিখন পরিকল্পনা এবং শিক্ষা পদ্ধতির ক্ষেত্রে সাঙ্গীকরণের নীতি যতটা সম্ভব অনুসরণ করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে দু ধরণের আপত্তি উঠতে পারে। প্রথমতঃ একজন শিক্ষকের পক্ষে সকল বিষয়ে পারদর্শিতা এবং সে বিষয়ে পাঠদানে তাঁর দক্ষতা বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিতে পারে। যদি এটা নাও হয় তাহলেও একই শিক্ষকের পক্ষে সকল শ্রেণীতে একই বিষয়ে পাঠদান করা সুবিধাজনক হবে কি? সুতরাং প্রাথমিক বিদ্যালয়েও বিষয় শিক্ষকের ধারণা আনা উচিত। এখন দেখা যেতে পারে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক কোনো একটি বিষয়ে কতটা বিশেষজ্ঞ হতে পারেন। সাধারণতঃ বিশেষীকরণহীন মাধ্যমিক শিক্ষার পরই যে কেউ প্রাথমিক শিক্ষক

হতে পারেন। শিক্ষক শিক্ষণের পাঠক্রমেও পদ্ধতি বিষয়ের ক্ষেত্রে কোনোরূপ বিশেষীকরণ নেই। সুতরাং যিনি প্রাথমিক শিক্ষক হতে চলেছেন তাঁকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল বিষয়েরই পাঠদানের যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করতে হয়। দ্বিতীয় আপত্তির ধরণ কিছুটা মনোবৈজ্ঞানিক। প্রশ্ন হল, যদি শিশুকে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের কাছাকাছি আনা যায় তাহলে তাঁদের প্রভাব কি শিশুটির বিকাশের পথে সহায়ক হবে? শিখনের দিক থেকে একটি শ্রেণীর জন্য একজন শিক্ষক এই ব্যবস্থার কিছু সুবিধা আছে তা আমরা লক্ষ্য করেছি। শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশের ক্ষেত্রেও শ্রেণী শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের নিয়ত প্রভাবের প্রয়োজনীয়তার কথাও আমরা জেনেছি। ভবিষ্যতে নীতি নির্ধারণের জন্য এ বিষয়ে আরও বিচার বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে। বর্তমানে উল্লিখিত সুবিধার দিকগুলির কথা বিবেচনা করে **একদল শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষক এই নীতিকে অবরোধহীনতা তত্ত্বের পঞ্চম অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।**

শিক্ষার্থীকে পরবর্তী শ্রেণীতে উন্নীতকরণের জন্য প্রচলিত পদ্ধতির পরীক্ষা ব্যবস্থার আর কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু শ্রেণীর কাজে শিক্ষার্থীর অগ্রগতির মূল্যায়ন এবং শিখনে যথাযথ নির্দেশনার সবসময় প্রয়োজন আছে। ধারাবাহিক এবং কার্যকরী শিখনের জন্য নিরবচ্ছিন্ন না হলেও মাঝে মাঝেই এই ধরণের মূল্যায়নের প্রয়োজন আছে। যে পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে তাতে শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন শিখন-কার্য পদ্ধতি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অগ্রগতির বিষয়ে জানতে পারবেন। বিভিন্ন শিক্ষার্থীর অগ্রগতির পরিমাণ শিক্ষক মহাশয় নিজের কাজের সুবিধার্থে মাঝে মাঝে লিখে রাখবেন। প্রতিটি পর্বের শেষে (ধরা যাক ত্রৈমাসিক) অপেক্ষাকৃত নিয়ম মাফিক পরীক্ষা নেওয়া উচিত। এই ধরণের পরীক্ষার দ্বারা দুটি উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে। এই অভীক্ষার দ্বারা একদিকে শিক্ষার্থীর অগ্রগতির পরিমাপ এবং অপরদিকে শিখনে শিশুর ত্রুটি নির্ধারণ করা সম্ভব। এই সকল অভীক্ষা অধিকাংশ শিখন একককে নিয়েই তৈরী করা হবে। বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রস্তুত একই স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন সমপর্যায়ের অভীক্ষা শিক্ষক মহাশয়দের হাতে পৌঁছে দিতে পারলে ভালো হয়। এই সকল অভীক্ষার সাহায্যে শ্রেণীর বিভিন্ন দলের গড় অগ্রগতি, বিভিন্ন দলের তুলনামূলক অগ্রগতি যেমন জানা যাবে তেমনি বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক অগ্রগতির পরিমাপ করাও সম্ভব হবে। **সুতরাং শিক্ষক কর্তৃক ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণমূলক মূল্যায়ন, বিভিন্ন ধরণের পার্বিক অভীক্ষা গ্রহণ এবং অভীক্ষার ফলাফলে বিশ্বস্তভাবে লিপিবদ্ধকরণ-ই শ্রেণীতে আটকে না রাখা নীতির ষষ্ঠ অনুসিদ্ধান্ত।**

যে শিক্ষা প্রণালীর কথা উল্লেখ করা হল সেটিকে সাধারণভাবে শ্রেণী-নিরপেক্ষ শিক্ষা প্রণালী বলা যেতে পারে। এটা লক্ষ্য করা গেল অবরোধহীনতা তত্ত্ব বা শ্রেণীতে আটকে না রাখা নীতি থেকেই শ্রেণী-নিরপেক্ষ শিক্ষা প্রণালীর কথা ভাবা হচ্ছে। এটা নতুন কোনো ধারণা নয়। ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থায় বহুকাল আগে থেকেই এই ব্যবস্থা রয়েছে। ইংরেজ শাসনের সুরু থেকেই এদেশে বিভিন্ন শ্রেণী

সম্বলিত বিদ্যালয় সংগঠিত করা হয়েছে। উডের ডেসপ্যাচেই (১৮৫৪) এই প্রণালীর সাংগঠনিক রূপরেখা দেওয়া হয়েছিল এবং এখন পর্যন্ত তাই চলে আসছে। বিগত শতাব্দীর শেষ থেকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে শ্রেণী-নিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থার চেষ্টা করা হচ্ছে যার ফলাফল ভালোমন্দ মেশানো। বর্তমান শতকের সুরু থেকেই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এই ধরণের শিক্ষা প্রণালী জোরদার এবং জনপ্রিয় হয়ে উঠে। এই ধরণের শিক্ষা প্রণালীর ধারণার একটা সার্বজনীন আবেদন লক্ষ্য করা যায় এবং বিভিন্ন দেশে বহুজনের স্বীকৃতিও পেতে থাকে। কোঠারী কমিশন (৬৪-৬৬) অপচয় এবং অবরোধ দূর করবার গুরুত্ব উপলব্ধি করে প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীকে,—সম্ভব হলে প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণীকে—একটি মাত্র শিখন-একক হিসাবে দেখবার সুপারিশ করেন। তাঁরা এও মনে করেন নিম্ন প্রাথমিক স্তরে প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণীকে একটি মাত্র একক হিসাবে দেখা উচিত, কারণ এর ফলে বিভিন্ন ধরণের পরিবেশ থেকে আসা শিক্ষার্থীরা তাদের নিজ নিজ সামর্থ্য মতো শিখতে পারবে। কোঠারী কমিশনের নির্দেশানুসারে ১৯৭১-৭২ সাল থেকে চণ্ডীগড় রাজ্যে এ ধরণের ব্যবস্থা চালু হয়েছে। চণ্ডীগড় প্রশাসন ঐ রাজ্যে এই শিক্ষা প্রণালীকে ক্রম পর্যায়ে চালু করছেন। কর্ণাটক রাজ্যেও ১৯৭৪ সাল থেকে এই প্রণালী চালু আছে এবং ১০৩টি বিদ্যালয়ে শ্রেণী-নিরপেক্ষ শিক্ষা প্রণালী সম্প্রসারিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, ঐ দুটি রাজ্যে শিক্ষক-ছাত্রের হার যথাক্রমে ১ : ৩২ এবং ১ : ৬০। সেক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষক-ছাত্রের হার ১ : ৩৬। ভারতের অন্যান্য রাজ্যসমূহের মধ্যে মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, তামিলনাড়ু, কেরল প্রভৃতি রাজ্যেও বেশ কিছুকাল যাবৎ প্রাথমিক শিক্ষায় বিভিন্ন স্তরে শ্রেণীতে আটকে না রাখা এবং শ্রেণী-নিরপেক্ষ বিদ্যালয় সংগঠনের নীতি গৃহীত ও অনুসৃত হয়েছে। এ ধরণের ব্যবস্থা নেবার ফলশ্রুতিস্বরূপ ঐসকল রাজ্যে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের দৈনিক উপস্থিতির হার যেমন বেড়েছে তেমনি মাঝখানে বিদ্যালয় পরিত্যাগের ঘটনাও কমেছে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষার নয়া শিক্ষাক্রমে শ্রেণীতে আটকে না রাখা নীতি গৃহীত হওয়ায় বিদ্যালয়কে শ্রেণী নিরপেক্ষরূপে সংগঠনের নীতি অবশ্যই একটি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। এ রাজ্যে বর্তমান শিক্ষা প্রণালী কঠোরভাবে স্তর অনুযায়ী শ্রেণীবিভক্ত শিক্ষাপদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং পরীক্ষা নিয়ন্ত্রিত। জনসাধারণও এ ধরণের ব্যবস্থার সঙ্গে সুপরিচিত। তাঁরা নতুন শ্রেণী নিরপেক্ষ শিক্ষা প্রণালী সম্বন্ধে আশঙ্কা এবং সন্দেহ প্রকাশ করছেন। এই ব্যবস্থা চালু হলে শিক্ষকদের শ্রেণীপাঠনার ক্ষেত্রে দায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে এবং পূর্বাপেক্ষা হয়তো বেশী কাজ করতে হবে ধরে নিয়ে শিক্ষকরাও এ সম্পর্কে কিছুটা বিতস্পৃহ হতে পারেন। কিন্তু রাজ্যের লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থীর কল্যাণের কথা ভেবে প্রাথমিক শিক্ষায় শ্রেণীতে আটকে না রাখা নীতির পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেণী-নিরপেক্ষ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংগঠনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিশদ আলোচনা একান্ত অপরিহার্য এবং এই নীতিকে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কার্যকরীভাবে ফলপ্রসূ করে তোলার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সযত্ন সহযোগিতায় জোরদার প্রস্তুতি চালানো আবশ্যক।

মূল ইংরাজী প্রবন্ধে ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দ ও তার অর্থবোধক কয়েকটি বাংলা শব্দ—যা এই প্রবন্ধের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে ঃ—

Curriculum—শিক্ষাক্রম
Learning—শিখন
Ability to learn—শিখন-সামর্থ্য
Continuous learning—ধারাবাহিক/নিরবচ্ছিন্ন শিখন
Detention—অবরোধ/আটক
Stagnation—অবরোধ
Wastage—অপচয়
Individualised—ব্যক্তিমুখী
Vertical stages—উলম্ব বিভাগ
Class teaching—শ্রেণী-শিক্ষাপদ্ধতি
Motivation—প্রেষণা
Integrated—সাঙ্গীকৃত
Corollary—অনুসিদ্ধান্ত
Non-Graded School—শ্রেণী-নিরপেক্ষ বিদ্যালয়

প্রাথমিক শিক্ষার রূপান্তর

শ্রীকমলকুমার চট্টোপাধ্যায়

গান্ধিজী বলেছিলেন, এ শিক্ষা ভারতবাসীকে দুটি ভাগে ভাগ করেছে—একটি হল মুষ্টিমেয় শিক্ষিত এবং অন্যটি হল বিপুল সংখ্যক নিরক্ষর জনতা। এই বিপুল সংখ্যক মানুষের নিরক্ষরতা দূর করতে হলে দেশের প্রাথমিক শিক্ষাকে গণশিক্ষার হাতিয়ার করে গড়ে তুলতে হবে। তারপর গঙ্গানদীর উপর দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। কিন্তু আমরা যেখানে ছিলাম সেখানেই মোটামুটি রয়ে গেছি।

প্রাথমিক শিক্ষা সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার মেরুদণ্ড। দেশের সমাজ-জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে গড়ে ওঠে বলে এই শিক্ষাকে বলা হয় দেশজ শিক্ষা। তাই দেশবাসীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনধারার সঙ্গে এই শিক্ষার রূপ ও কাঠামোর সম্পর্ক অত্যন্ত বেশী। অথচ আমাদের দেশে, প্রাথমিক শিক্ষার আধুনিক কাঠামো গড়ে উঠেছে দেশজ শিক্ষার ধ্বংসস্তূপের উপর। খ্যাতনামা মিশনারী শিক্ষাবিদ্ উইলিয়ম এ্যাডামের সতর্কবাণী না শোনার পরিণামে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি পরগাছায় পরিণত হতে বেশীদিন দেরী হয়নি। উনিশ শতকের প্রথমদিকে সরকারী নীতি ছিল উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। ফলে শিক্ষার অন্যান্য স্তরের উন্নতি তখন হলেও প্রাথমিক শিক্ষা অবহেলিত হয়েছে। স্বাধীন ভারতে প্রাথমিক শিক্ষার পরিমাণগত উন্নতি আমরা দেখেছি। কিন্তু আপাতদৃষ্ট পরিসংখ্যানের পেছনে ফুটে উঠেছে দুরারোগ্য ব্যাধির কতকগুলি লক্ষণ।

প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য কি? এই স্তরের শিক্ষার নিজস্ব কোনো লক্ষ্য থাকতে পারে আমরা কখনও চিন্তা করিনি। প্রাথমিক শিক্ষার কাজ মাধ্যমিক স্তরের জন্য ছেলেমেয়েদের প্রস্তুত করা, যেমন, মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য উচ্চশিক্ষার জন্য প্রস্তুতি। এই চিন্তাধারার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হচ্ছে মুষ্টিমেয় কৃতীদের জন্য শিক্ষা (Education for the Elites)। প্রাথমিক শিক্ষাস্তর বলতে মনে করা হয় ১৪+বয়সের সকল ছেলেমেয়ের অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষামানের সার্থক সমাপ্তির স্তর। এই স্তরের মধ্যে রয়েছে তিনটি পরিপূরক অংশ – প্রাক্ প্রাথমিক, নিম্ন প্রাথমিক এবং উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষাকাল। কোন ছেলেমেয়ে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হলে তাকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিনা বাধায় অগ্রসর হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের পর শিক্ষার্থীরা জীবিকা অর্জনের জন্য বৃত্তিমুখী শিক্ষার কথাই ভাববে। অল্পসংখ্যক ছাত্র সাধারণ শিক্ষা বা উচ্চতর শিক্ষায় অগ্রসর হবে। যদিও নতুন শিক্ষা কর্মসূচীতে আমরা বিদ্যালয়ের প্রথম দশ শ্রেণীর শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার একটি সুসংবদ্ধ স্তর হিসাবে দেখাতে চাইছি, কিন্তু বাস্তব অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। অধিকাংশ ছেলেমেয়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ গ্রহণ করতে পারছে না।

সুতরাং শিক্ষাপ্রসারের বর্তমান কর্মসূচীতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া উচিত প্রথম আট বছরের শিক্ষাক্রমের উপর। চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ সমাপনের পর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বেশীর ভাগ ছাত্রছাত্রী পঞ্চম শ্রেণীতে প্রবেশের অধিকার পায় না। কারণ সাংগঠনিক ত্রুটি। তাই চার শ্রেণীর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছেলেমেয়ে যাতে নিকটবর্তী কোন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারে তার সাংগঠনিক ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে না পারা পর্যন্ত এই ত্রুটি দূর করা সম্ভব হবে না। বর্তমান পরিস্থিতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার রূপান্তর হবে পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থার সংগঠন (Development of complete primary school system)। যতদিন অসম্পূর্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকবে ততদিন শিক্ষার ক্ষেত্রে অপচয় (wastage) আমরা রোধ করতে পারব না। বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে প্রত্যেক ছেলেমেয়ে যাতে প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে যেতে পারে তার ব্যবস্থাও এই সঙ্গে করতে হবে। সকলের জন্য আট বছরের সর্বজনীন শিক্ষাকাল নির্দিষ্ট করার ভিত্তিতেই প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে আলোচনা করা উচিত। কোন শিক্ষাস্তরের লক্ষ্য সম্বন্ধে এক কথায় কিছু বলা বিপজ্জনক। তবুও সংক্ষেপে বলা যেতে পারে সম্পূর্ণ প্রাথমিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য হবে আধুনিক ভারতের দ্রুত পরিবর্তনশীল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় যোগ্য অংশ গ্রহণ করতে পারে এমন নাগরিক সৃষ্টি করা। আজকে নাগরিকদের হতে হবে গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় উদ্‌বুদ্ধ, শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে সুস্থ ও সবল এবং ভারতীয় সমাজের কল্যাণকর পরিবর্তনের জন্য আগ্রহী। কৃষি, শিল্প ও অন্যান্য ক্ষেত্রে উন্নয়নের কাজে যাতে সকলে যোগ্য অংশ গ্রহণ করতে পারে তার দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রত্যেকটি ছেলেমেয়েকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে হলে উৎপাদনশীল কর্মকুশলতা বৃদ্ধির উপর পাঠ্যসূচীতে ব্যবস্থা রাখতে হবে। সামাজিক রূপান্তরের হাতিয়ার হবে শিক্ষা—এই বক্তব্যের সার্থক রূপায়ণ আজকের শিক্ষাবিদ্‌দের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। প্রত্যেকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাতে সর্বজনীন সুযোগ সৃষ্টি (Universality of Provision) করা সম্ভব হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে না পারলে সামাজিক রূপান্তরে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে। শহরের নামজাদা শিশু-বিদ্যালয় ও গ্রামের অখ্যাত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে এ বিষয়ে যে পার্থক্য রয়েছে যে কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে তা চরম লজ্জার বিষয়।

প্রাথমিক শিক্ষা চাই কেন? আমাদের জীবনে এর মূল্য কি? বেশীর ভাগ মানুষের মধ্যে এ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা নেই। দারিদ্র্য ও অভাবগ্রস্ত মানুষ অন্ন, বস্ত্র এবং আশ্রয়ের কথা স্বাভাবিক ভাবে চিন্তা করে। কিন্তু শিক্ষার অভাব তাঁদের কাছে এত প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয় না কেন? এক কথায় এর উত্তর হল নিদারুণ দারিদ্র্য। দারিদ্র্য মানুষকে কোথায় নিয়ে যায় সে সম্বন্ধে বিত্তভোগী সমাজের কোন ধারণা নেই। জীবনের স্বাভাবিক স্বাদ, সভ্য জীবনযাপনের আকাঙ্ক্ষাকেও দারিদ্র্য নষ্ট করে দেয়। সুতরাং গরীব মানুষের শিক্ষাবিমুখতাকে সঠিকভাবে বুঝতে হবে। তার সঙ্গে রয়েছে বোঝানোর ব্যাপারে শিক্ষিত সমাজের দায়িত্ব। অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়ের অধিকারের মতো স্বাস্থ্য, শিক্ষা,

সংস্কৃতি আমাদের মৌলিক অধিকারের মধ্যে পড়ে এবং সেই অধিকার অর্জন করতে হবে—এই চেতনা গরীব মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করবে বিভিন্ন গণসংগঠন। শিক্ষার রূপরেখা নির্ণয়ের সময় সমাজের বৃহত্তর অংশের প্রয়োজনের কথা বারবার চিন্তা করতে হবে। দুঃখের বিষয় শিক্ষা-পরিকল্পনায় আমরা এতদিন এর বিপরীত চিত্রই দেখেছি। স্বাধীন ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন, মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন, সর্বশেষে ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (কোঠারী কমিশন) গঠিত হতে দেখেছি। কিন্তু আজও প্রাথমিক শিক্ষা কমিশনের কোন উচ্চবাচ্য হতে দেখলাম না। কেউ যদি অভিযোগ করেন এখনও মেকলে সাহেবের ক্রমনিম্ন পরিশ্রুত মতবাদের (Downward Filtration Theory) ভূত আমাদের সমাজের মাথায় চেপে বসে আছে, তাহলে কি তার প্রতিবাদ করা যাবে? শিক্ষিত মানুষের ছেলেমেয়েদের জন্য রয়েছে শহরাঞ্চলের নামজাদা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়। সুতরাং তাদের মাথাব্যথা শিক্ষার কাঠামো ১০+২+৩ হবে, না ১০+২+২ হবে। সবচেয়ে বড় পরিহাসের বিষয় হচ্ছে কাদের জন্য এই চিন্তা করছি তাই বোধহয় আমরা নিজেরাও জানি না। দেশের অধিকাংশ ছেলেমেয়ে দশ ক্লাশের আগেই হারিয়ে যায়। এখানে একটা ছোট্ট পরিসংখ্যান উল্লেখের লোভ সামলাতে পারছি না। পশ্চিম বাংলায় পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকীয় পরিকল্পনার শেষে (১৯৭৯ সালে) বিদ্যালয়ে কত ছেলেমেয়ে যাবে তার লক্ষ্য (Targets) নির্ধারণ করা হয়েছিল। ঠিক হয়েছিল প্রতি ১০ জন বালক-বালিকার মধ্যে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ সমাধা করবে ৯ জন, অষ্টম শ্রেণীর শেষ পর্যন্ত যাবে ৪ জন এবং মাধ্যমিকস্তরের শেষ পর্যন্ত পৌঁছবে মাত্র ২ জন। অর্থাৎ আমাদের বহুঘোষিত ১০+২+৩ শিক্ষা কাঠামোয় হারাধনের দশটি ছেলেমেয়েদের মতো আটটি ছেলেমেয়ে প্রথম ধাপ শেষ হওয়ার আগেই হারিয়ে যাবে। বোধহয় এই কারণে শিক্ষা-কর্মসূচী প্রণয়নের সময় আমরা ভাবতে বসি ঐ মুষ্টিমেয় কয়েকটি ছেলেমেয়ের স্বার্থের কথা, যারা শেষ পর্যন্ত উচ্চশিক্ষার তোরণটি অতিক্রম করবে। এই চিন্তার প্রতিফলন দেখা যায় এমন কি প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যসূচী ও কর্মসূচী প্রণয়নের সময়েও প্রাথমিক-মাধ্যমিক শিক্ষা হয়ে পড়ে উচ্চশিক্ষার লেজুড়। সময়ে সময়ে এমন অবাস্তব কথা শিক্ষিত মানুষেরা বিভিন্ন শিক্ষা-সম্মেলনে আলোচনা করেন যাতে মনে হয় আমরা এক সমষ্টিগত আত্মপ্রবঞ্চনার খেলায় মেতে উঠেছি! এই পথ থেকে আমাদের ফিরতে হবে। কাদের জন্য কথা বলছি, পরিকল্পনা করছি, পরিষ্কার করে চিন্তা করতে হবে এবং তার পথ ঠিক করে নিতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার রূপ কি হবে তা ঠিক করার সময় মনে রাখতে হবে দেশের ছেলেমেয়েদের শতকরা ১০০ জনের শক্তি-সামর্থ্য এবং স্বার্থের কথা। যদি এর ফলে শিক্ষা-কর্মসূচীর আমূল পরিবর্তন হয় লক্ষ্যগুলি (Targets) কিছুটা নামিয়ে আনতে হয়, তবে সমষ্টিগত স্বার্থে তা করতে হবে। প্রত্যেকটি পরিবার যেন চিন্তা করতে পারে এই শিক্ষা তাঁর ছেলেমেয়েদের স্বার্থে পরিচালিত হচ্ছে। দরিদ্র মানুষের একাত্মবোধ তবেই সৃষ্টি করা সম্ভব হবে শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে।

প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের পথে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক কি? ভারত সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের উদ্যোগে ১৯৬২ সালে একটি সমীক্ষা চালানো হয়েছিল, গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের

সমস্যার উপর (Problems of Extension of Primary Education in Rural Areas)। রিপোর্টের একটি অংশে বিভিন্ন ধরণের চাষী পরিবারের শতকরা কত অংশ ছেলেমেয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাচ্ছে তার হিসাব দেওয়া হয়েছে। যেসব গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে সেই সব গ্রামের বড় চাষী পরিবার থেকে শতকরা ৮৪'৪ জন, মধ্যম চাষী পরিবার থেকে শতকরা ৭৩'৬ জন, ছোট চাষী পরিবার থেকে শতকরা ৬৪'০ জন এবং ভূমিহীন চাষী পরিবার থেকে শতকরা ৫১'৫ জন। যেসব গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই সেই সব গ্রামের ছেলেমেয়েদের কত অংশ বিদ্যালয়ে যায় তার হিসাবও দেওয়া হয়েছে। বড় চাষী পরিবার থেকে শতকরা ৬৬'০ জন, মধ্যম চাষী পরিবার থেকে শতকরা ৪৮'১ জন, ছোট চাষী পরিবার থেকে শতকরা ৪৬'২ জন এবং ভূমিহীন চাষী পরিবার থেকে শতকরা ৩৫'৬ জন। উল্লিখিত সমীক্ষার রিপোর্টের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য :

"One of the disturbing findings of the study is the relatively low level of school-going among the children of landless labourers and tenants."

এই ঘটনার কারণ হিসাবে বলা হয়েছে :

"A study of the reasons for this state of affairs shows that financial difficulties of the parants figure permanently as an inhibiting factor."

নানা রকম আর্থিক সুযোগ-সুবিধা দিয়ে এই সকল পরিবারের ছেলেমেয়েদের কিভাবে বিদ্যালয়ে আনা যায় তা উল্লেখ করে এই রিপোর্টে বলা হয়েছে :

"Even then, there will be another difficulty faced by the children of these weaker sections, namely, the pressure on them to engage in work either to help their parents in occupational jobs or to relieve them from domestic chores (specially for girls). It is difficult to foresee any weakening of this pressure in the near future."

তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে গ্রামের এবং শহরের মানুষের দারিদ্র্যের একটা নিকট সম্পর্ক রয়েছে। দেশের মানুষের আর্থিক অবস্থার অবনতির সঙ্গে শিক্ষা প্রসারের পথও রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। এ উপলক্ষে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক অর্থনৈতিক সমীক্ষার বক্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে।

পশ্চিম বাংলার অধিবাসীদের আর্থিক অবস্থা অনুসন্ধান করে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য উন্নয়ন পরিষদ একটি রিপোর্টে বলেছেন, পশ্চিম বাংলার অধিবাসীদের শতকরা ৭০ ভাগ দারিদ্র্যসীমার নীচে পড়ে আছে। ১৯৭১ সালের আদমসুমারিতে দেখা গেছে যে, পশ্চিম বাংলায় যারা খেটে খায় সেই ১২৬ লক্ষ লোকের মধ্যে ৭২'৫ লক্ষ জন বা শতকরা ৫৭'৫ ভাগ কৃষিতে নিযুক্ত এবং মোট কৃষিজীবীদের মধ্যে শতকরা ৪৪'৮ জন ভূমিহীন।

আর একটি হিসাব উল্লেখ করছি। ন্যাশন্যাল স্যাম্পল সার্ভের (এন. এস. এস.) সর্বশেষ (১৯৭১-৭২) হিসাব থেকে জানা যায় ভূমিহীন এবং প্রায়-ভূমিহীন (১/৩ বিঘার নীচের মালিক) পরিবার সমগ্র কৃষি-পরিবারের প্রায় ৫৯ ভাগ। এরই পাশাপাশি ১৯৭১-র সেন্সাসে গণনা অনুযায়ী গ্রামে শ্রমক্ষম মানুষের ৩৩ শতাংশ ক্ষেতমজুরে পরিণত হয়েছে (শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—"পশ্চিম বাংলার আশীভাগ গ্রাম", আনন্দবাজার পত্রিকা, ৭-৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭৭)।

উপরের পরিসংখ্যানগুলির ভিত্তিতে বলা যেতে পারে সাম্প্রতিক কালের বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী বৃদ্ধির বেশীর ভাগ এসেছে সমাজের অন্যান্য অংশ থেকে। কলকাতা মহানগরী সম্বন্ধেও এই কথাটি সত্য। বেশ কয়েক বছর আগের হিসাব অনুযায়ী এই মহানগরীর প্রায় দেড় লক্ষ শিশু নিরক্ষর এবং এদের বেশীর ভাগই বস্তীবাসী।

আজ প্রশ্ন উঠেছে বর্তমান শিক্ষা কাঠামোর মধ্যে যদি দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে আনা না যায় তবে আমাদের অন্য কোন কাঠামোর কথা ভাবতে হবে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার আথিক সুযোগ-সুবিধাগুলি দরিদ্র মানুষের মধ্যে কিভাবে প্রসারিত করা যায় সেই সমস্যা যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে শিক্ষার সুযোগ বিত্তহীন মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার সমস্যাটি। অতএব প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের সমস্যাটিকে অর্থনৈতিক ধনবণ্টন এবং দরিদ্র জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে হবে। গতানুগতিক শিক্ষা কাঠামোতে আথিক সুবিধাগুলির মতোই শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা গ্রাম ও শহরের বিত্তসম্পন্ন পরিবারগুলির হাতে এসে পড়ছে। কল্যাণকর রাষ্ট্রের কাছে সবাই আশা করে সমাজের দুর্বলতম জনগোষ্ঠীর মধ্যে উন্নয়নের সুযোগ-সুবিধাগুলি যাতে পৌঁছায় সেই সম্বন্ধে সক্রিয় ব্যবস্থা দুর্বল শিল্পকে গড়ে তোলা বা সাহায্য করা যেমন সরকারের দায়িত্ব, তেমনি, বোধহয় তার চেয়েও বেশী দায়িত্ব রয়েছে দরিদ্র মানুষকে শিক্ষার ব্যাপারে সাহায্য করা। এ সম্বন্ধে কয়েকটি সুপারিশ করা যায়।

এই রাজ্যের কথাই বলি। পশ্চিম বাংলার জনগোষ্ঠীর ওপর সামাজিক-অর্থনৈতিক সমীক্ষা ও সেন্সাস রিপোর্টের ভিত্তিতে অনুন্নত অঞ্চল এবং পিছিয়ে পড়া জনসমষ্টির একটা বাস্তবচিত্র সহজেই পেতে পারি। দেখা যাবে শিক্ষার অনুন্নয়নের সঙ্গে জীবনধারণের মান, জমিহীন কৃষকের সংখ্যা এবং তপশিলী জাতি, উপজাতি ও সম্প্রদায়ের উপস্থিতির একটা নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে। এই তথ্যের ভিত্তিতে আমরা পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলার কয়েকটি অঞ্চলকে অনুন্নত হিসাবে নির্দিষ্ট করতে পারি। প্রত্যেকটি অঞ্চলের অনুন্নয়নের বৈশিষ্ট্য এবং কারণগুলি অনুসন্ধান করে সেই অঞ্চলের জন্য সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা প্রসার এই সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনারই অবিচ্ছেদ্য অংশ। শিক্ষা-পাঠক্রম, কর্মসূচী, সময়-তালিকা, শিক্ষক-শিক্ষণ, বিদ্যালয়-গৃহ, শিক্ষা-উপকরণ, ছাত্রছাত্রী-দের জন্য পোশাক, বইপত্র, দ্বিপ্রাহরিক আহার সরবরাহ প্রভৃতি সমস্যাগুলির সমাধান সম্পর্কে এই পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। পশ্চিমবাংলার এক একটি অঞ্চলের সমস্যা এক এক রকম। তাই

উপরোক্ত সমস্যার ক্ষেত্রে সমাধানের রূপ একরকম না-ও হতে পারে। প্রসঙ্গত:, বিদ্যালয়ের ছুটি ও সময় তালিকা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়ে অভিভাবকদের জীবিকা ও বৃত্তির প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়। চাষের কাজ যে সময় চলে তখন মাঠে অভিভাবকদের সাহায্য করার জন্য ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দরকার হয়। বিদ্যালয়ের দীর্ঘ-ছুটির (Vacation) তালিকা ঠিক করার সময় সেই অঞ্চলের কাজ কোন্ সময় চলে মনে রাখা উচিত। সময়-তালিকা (Time-table) ঠিক করার বেলায় একই কথা। সমগ্র রাজ্যের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের একটা নিদিষ্ট কাঠামোর মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রয়োজন অনুসারে কিছু কিছু রদবদল করা যায় কিনা ভেবে দেখতে হবে।

শিক্ষা-পরিকল্পনা ও শিক্ষা-প্রশাসনের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন আনতে হবে। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার পরিবর্তে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক পরিকল্পনার সমন্বয়ের কথা ভাবা উচিত। শিক্ষা-প্রশাসনের ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসনকে উপযুক্ত ক্ষমতা ও দায়িত্ব দিতে হবে। আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের উপর অনেকদিন আগেই দেওয়া হয়েছে। কিন্তু নানা কারণে স্থানীয় গণউদ্যোগ ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে বিরাট ফাঁক থেকে গেছে। সচেতন প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই অভাবকে দূর করতে হবে। স্থানীয় প্রশাসনে গরীব মানুষের প্রতিনিধিত্ব এবং নেতৃত্ব সুনিশ্চিত করার উপায় উদ্ভাবন করা দরকার। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির পরিচালন-ব্যবস্থায় অভিভাবকদের কি কি ভাবে যুক্ত করা যায়, কিভাবে তাঁদের উৎসাহিত করা যায় তার উপায় নির্ধারণ করা আশু প্রয়োজন। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি, প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য চলতি প্রাথমিক শিক্ষা আইন যথেষ্ট নয়। এই রাজ্যে সর্বস্তরে প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করার জন্য চলতি আইনের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি সংশোধন করতে হবে। মূল প্রশ্নটি হচ্ছে প্রশাসনে গরীব মানুষের উদ্যোগ নেওয়ার ব্যবস্থা রাখা। নতুন বিদ্যালয় স্থাপনের পূর্বে স্থানীয় প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। অতীতে এই সম্পর্কে অনেক ব্যতিক্রম দেখা গেছে—যার ফলে বহু বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা অত্যন্ত সামান্য, অপরদিকে জনবহুল গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে ওঠেনি। এই ব্যাপারে বিদ্যালয় পরিদর্শকমণ্ডলী বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু এই কাজের জন্য অবশ্য পরিদর্শকদের উপযুক্তভাবে প্রস্তুত করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা প্রসার ও উন্নয়নের দিকে দৃষ্টি রেখে অতীতে বহু কমিটি মূল্যবান সুপারিশ করেছেন। কিন্তু উপযুক্ত সামাজিক-অর্থ নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবে সেগুলি কাগজেই থেকে গেছে। সুপারিশগুলি যাতে কাজে পরিণত হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষার সার্থক রূপায়ণ কোন্ পথে হবে? নিঃসন্দেহে সরকারের অনেকগুলি বিভাগের সমবেত কর্মপ্রচেষ্টায় এই রূপান্তর আসতে পারে। শিক্ষা, সমাজশিক্ষা, সমাজসেবা, কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প, সমবায় (কো-অপারেটিভ), প্রচার ও জনসংযোগ, এমনকি কৃষি, পশুপালন প্রভৃতি বিভাগের সমবেত পরিকল্পনা ও অংশগ্রহণ ছাড়া আমাদের দেশে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা রূপায়ণ সম্ভব নয়। যুদ্ধকালীন কর্মতৎপরতা ছাড়া অশিক্ষার অভিশাপ আমাদের দেশ থেকে দূর করা যাবে না। বলাই বাহুল্য

প্রাথমিক শিক্ষকগণ এবং তাঁদের সংগঠনগুলি এই পরিবর্তনে যোগ্য অংশ গ্রহণ করতে পারেন। এর সঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষণকেন্দ্রগুলির ভূমিকার কথা। দুঃখের বিষয় বর্তমান শিক্ষক-শিক্ষণ পাঠক্রমের মধ্যে যুগোপযোগী দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব রয়ে গেছে। সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষার বাঞ্ছিত রূপান্তরের কাজ শুরু হওয়া উচিত শিক্ষক-শিক্ষণকেন্দ্রগুলি থেকে। শিক্ষণকেন্দ্রগুলি বা মহাবিদ্যালয়গুলি কেবলমাত্র শিক্ষণ কাজে নিযুক্ত থাকবেন, তা হতে পারে না। শিক্ষণের সার্থক ফলশ্রুতি হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য, এবং স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি ঠিক মতো কাজ করতে পারছে কিনা তা বোঝার জন্য প্রত্যেকটি শিক্ষণকেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে কতকগুলি বিদ্যালয়-পুঞ্জ (school-complex) নির্দিষ্ট করে দেওয়া যেতে পারে। পঠন-পাঠন, মূল্যায়ন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির ব্যাপারে শিক্ষণকেন্দ্রগুলি প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব দেবে। এই প্রশাসনিক ব্যবস্থা যদি সম্ভব হয়, তবে শিক্ষণকেন্দ্র ও মহাবিদ্যালয়গুলির পাঠক্রম, কর্মসূচী এবং পঠন-পাঠনের মধ্যে আসবে একটি বাস্তববোধ, যার অভাবে আজ শিক্ষক-শিক্ষণ কর্মসূচী একেবারে অর্থহীন হয়ে পড়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে বিদ্যালয় পরিদর্শকদের ভূমিকাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে শিক্ষা-আন্দোলন এক নতুন দিগন্তের সৃষ্টি করেছে। পশ্চিমের দেশগুলির শিক্ষা পরিকল্পনার কাঠামো এই দেশগুলিতে অকেজো বলে প্রমাণিত হয়েছে। ভারতের সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্যর দিকে লক্ষ্য রেখে প্রাথমিক শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষার নব-রূপায়ণের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযান এক নতুন তাৎপর্য নিয়ে আসবে আমাদের সমাজ-জীবনে।

[পুনর্মুদ্রিত]

প্রাথমিকস্তরে
বাংলা পঠন-পাঠনের ক্রমায়ণ

শ্রীমতী কৃষ্ণা বসু

এ বছর থেকে যে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম চালু হয়েছে তার অন্যতম নির্দেশ হল "চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত কোনো শ্রেণীতেই কোনো শিক্ষার্থীকে শিক্ষা-বর্ষান্তে আটকে রাখা হবে না। সামগ্রিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রয়োজনবোধে কাম্য উপযুক্ততা অর্জনের জন্য কোনো কোনো শিক্ষার্থীকে পঞ্চম শ্রেণীতে অতিরিক্ত এক বছর রাখা যেতে পারে।"

উল্লিখিত নির্দেশের সুদূরপ্রসারী ফলাফল এবং প্রকৃত তাৎপর্য কি হতে পারে সে সম্পর্কে অন্যত্র (শ্রীযুক্ত নিঃশঙ্ক ঘোষ-উপাধ্যক্ষ মহাশয়ের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) বিস্তারিত বিচার-বিশ্লেষণ উপস্থাপিত করা হয়েছে। তবু "বাংলা পঠন-পাঠনের ক্রমায়ণ" (Gradation, পর্যায়) কেন অপরিহার্য, এটা করার উদ্দেশ্যই বা কী তা জানার জন্য মুখবন্ধস্বরূপ কয়েকটি প্রাসঙ্গিক কথা জানা প্রয়োজন

শিক্ষা কমিশনের কথা ঃ

ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪-৬৬) তাঁদের প্রতিবেদনে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে ক্রমহীন বা অক্রমিক এককের (ungraded unit) সুপারিশ করে লিখেছেন—

"প্রথম শ্রেণীর শেষে পরীক্ষা বন্ধ হওয়া উচিত এবং প্রথম দুটি শ্রেণীকে (যেখানে সম্ভব প্রথম তিনটি বা চারটি) একটিমাত্র শিখন একক (teaching unit) হিসাবে দেখা উচিত— যার মধ্যে প্রতিটি শিশুই নিজ নিজ সামর্থ্যমত অগ্রগতি করবে (পৃঃ ১৫৯) নিম্ন প্রাথমিক (১-৪ শ্রেণী) স্তরের জন্য শিক্ষাক্রম রচনার সময়ও কমিশন ঐ কথার পুনরুল্লেখ করেছেন (পৃঃ ১৮৮)।"

অবরোধ (stagnation) সমস্যার হাত এড়াবার জন্যই কমিশন ঐ ধরণের প্রতিবিধানের উল্লেখ করেছেন। অবরোধ হল বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হবার ফলশ্রুতিস্বরূপ একই শ্রেণীতে একাধিক বছর আটকে থাকা। সাধারণতঃ অবরোধ হলে গ্রামাঞ্চলের শিশুরা বিদ্যালয় ছেড়ে যায়। সুতরাং অবরোধই অপচয়ের (wastage) অন্যতম কারণ। যদি অবরোধ বন্ধ করা যায় তাহলে অপচয় কমিয়ে আনা সম্ভব। বার্ষিক পরীক্ষায় পাশ-ফেলের রীতি তুলে দেওয়ার ফলে শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ সামর্থ্যমত শিখবে এবং অগ্রগতি করতে পারবে।

সহায়তা ঃ শ্রীআলোক মাইতি

বিদেশে এ ধরণের বিদ্যালয় আছে। সেখানে অবশ্য অপচয় অবরোধ সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য এটা করা হয়নি। শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিখন-সামর্থ্যের যে পার্থক্য আছে সেটা মনে রেখেই করা হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীরা স্ব-স্ব সামর্থ্যের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে সক্ষম হয়।

নতুন ধরণের প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ

শিক্ষা কমিশনের উদ্দেশ্যানুযায়ী ইতিমধ্যে ভারতের বেশ কয়েকটি রাজ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আটকে না রাখা নীতি গৃহীত হয়েছে এবং কতকগুলি ক্ষেত্রে ফলাফল বেশ সন্তোষজনক (এ সম্পর্কে পত্রিকার অন্যত্র একটি প্রবন্ধ দেওয়া হল)।

এই ধরণের বিদ্যালয়ে ধীরগতি থেকে দ্রুতগতি শিখন-সামর্থ্যের সকল শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক উর্ধ্বমুখী অগ্রগতি (Continuous upward progression) সুনিশ্চিত করা হয়। এ ধরণের বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী শিখনের সময় নিজের সর্বোচ্চ সামর্থ্যকে কাজে লাগাতে পারে। স্বশিখনের সন্তোষ অধিকতর উৎসাহ সৃষ্টি করে বিষয়বস্তুর উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে শিখন হয় গভীর ও কার্যকরী যা পরবর্তী বিষয় শিখতে সহায়তা করে। শুধু তাই নয় সামর্থ্য অনুসারে শিখন হওয়ায় অযথা পুনরুক্তি বা শিখনের শূন্যতা দুই-ই এড়ানো সম্ভব হয়। আবার অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত ভাল ছেলেদের একঘেয়েমি যেমন কাটবে (নিছক পড়া সঙ্গীদের সঙ্গে শিখতে হচ্ছে না বলে) তেমনি অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের মানসিক উত্তেজনাও কমবে (ভাল ছেলেদের সঙ্গে দ্রুত তাল রাখতে গিয়ে ফেল করার সম্ভাবনা নেই বলেই)।

আমাদের দেশজ বিদ্যালয়গুলিতে কিংবা ডাল্টন পরিকল্পনার মধ্যে ঐ ধরণের বিদ্যালয় ব্যবস্থার ইংগিত লক্ষ্য করা গেলেও বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উল্লিখিত যে ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে তার জন্য বিশেষ প্রস্তুতি না থাকলে অধিকতর জটিল সমস্যা দেবার সমূহ সম্ভাবনা।

শিক্ষকের নতুন দায়িত্বঃ

পশ্চিমবঙ্গে একটি নতুন প্রাথমিক শিক্ষাক্রম প্রবর্তিত হয়েছে—শিক্ষাক্রমে শ্রেণীতে আটকে না রাখার নীতিও গৃহীত হয়েছে। অথচ শিক্ষাক্রমে একেকটি বিষয় নিছক শ্রেণী অনুসারে বিন্যস্ত আছে। কিন্তু নির্দিষ্ট শ্রেণী ও বিষয়ের ক্রমপর্যায় সুস্পষ্টভাবে বিন্যস্ত না থাকার ফলে শিক্ষকদের বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। প্রতিটি বিষয়ের একক এবং এককগুলির মধ্যেও যে বিভিন্ন বিভাগ সুস্পষ্ট বিভাজন না থাকার ফলে—শিখন-সামর্থ্য অনুসারে শিক্ষার্থীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী বিষয়টি সুনির্ধারিত করা যাচ্ছে না। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হতে পারে—

শিক্ষার্থীর মধ্যে "বলা" শিখন-সামর্থ্যের বিকাশ ঘটুক এটা যদি শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য হয় তাহলে "বলা" এই শিখন-সামর্থ্যের মধ্যে যে সকল উপবিভাগ আছে সেগুলি যেমন চিহ্নিত করতে হবে তেমনি

প্রতিটি স্তরে (বর্তমান ব্যবস্থায় শ্রেণী বা শিক্ষাবর্ষ কথাটিও ব্যবহার করা যেতে পারে) শিক্ষার্থীরা উল্লিখিত এককের কোন্ কোন্ উপ-এককগুলি আয়ত্ত করবার পরে পরবর্তী একক শিখবে তাও সুনির্ধারিত করা প্রয়োজন।

সুতরাং দেখা গেল শ্রেণীতে আটকে না রাখার নীতি অনুসরণ করতে হলে প্রতিটি বিষয়ের উদ্দেশ্য শিখন-সামর্থ্য স্তর অনুসারে একক বিভাজন একান্ত অপরিহার্য। উল্লিখিত দৃষ্টিকোণ থেকে পশ্চিমবঙ্গের নতুন প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে মাতৃভাষা বাংলার শ্রেণী অনুসারে যে যে কার্যক্রম দেওয়া হয়েছে সেগুলির পুনর্বিন্যাস করে ক্রমায়ণ বা পর্যায়ক্রমে সাজানো দরকার। এর ফলে শ্রেণীতে শিক্ষকের পাঠ পরিচালনার যেমন সুবিধা হবে তেমনি শিক্ষার্থীর পক্ষেও বিষয় আয়ত্ত করার সুবিধা হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ এ ধরণের পর্যায় অনুসরণ করে শ্রেণীতে পঠন-পাঠন কার্য পরিচালনা করলে যে সুবিধা (বা অসুবিধা) হতে পারে তার অভিজ্ঞতার আলোকে ভিন্নতর পন্থা নিরূপণ করা যেতে পারে।*

সামর্থ্য : শ্রবণ

(১) কথোপকথন, গল্প, ভাষণ এবং আলোচনার মূল বিষয় আয়ত্ত করা

(২) বক্তব্যের কেন্দ্রীয় ভাবটি অনুসরণ বা বুঝতে পারা

(৩) বক্তার মেজাজ ও অনুভূতি আবেগ বুঝতে পারা

(৪) কবিতা, গল্প, নাটক, আলোচনা ইত্যাদি শুনে আনন্দলাভ করা

ক্রম : এক/দুই	তিন	চার	পাঁচ
১) ধৈর্যসহকারে শোনা, নির্দেশ অনুসরণ, কথোপকথন বুঝতে পারা।	মনোযোগসহ শোনা	মনোযোগসহ শোনা	মনোযোগসহ শোনা
২) গল্পের মূল বক্তব্য আয়ত্ত করতে পারা।	গল্প, কবিতা ও আলেচনার মূল বক্তব্য ধরতে পারা।	গল্প, কবিতা, নাটক ও আলোচনাদির ঘটনা-ভাব-অনুভূতির পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝতে পারা	গল্প, নাটক, আলোচনা, কথোপকথন ও খবরাদি থেকে সহজভাবে কার্যকারণ সম্পর্ক অনুমান করতে পারা
৩) সহজ গল্প ও কবিতা শুনে আনন্দলাভ করতে পারা।	পূর্বক্রমের মত	পূর্বক্রমের মত	নাটক বা আলোচনাদিতে বক্তার মেজাজ ধরতে পারা

*প্রয়োজন মতো জাতীয় শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সংস্থার বই-পত্রাদির সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

সামর্থ্য ঃ কথন

(১) শুদ্ধ ও পরিচ্ছন্নভাবে বলতে পারা
(২) কথোপকথন ও আলোচনায় অংশগ্রহণের সামর্থ্য
(৩) সহজভাবে ছোট ছোট গল্প বলতে পারা
(৪) দেখা, শোনা, পড়া ও অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়কে সহজভাবে বর্ণনা করতে পারা
(৫) নিজের ভাব ও অনুভূতিকে প্রকাশ করতে পারা

ক্রম ঃ এক/দুই	তিন	চার	পাঁচ
১) যথাযথ শুদ্ধ উচ্চারণ, শ্বাসাঘাত এবং স্বরভঙ্গী সহকারে কথা বলতে পারা	যথাযথ শুদ্ধ উচ্চারণ, শ্বাসাঘাত ও স্বরভঙ্গী এবং সাবলীলতার সঙ্গে কবিতা আবৃত্তি, গল্প বলতে পারা	যথাযথ শুদ্ধ উচ্চারণ, শ্বাসাঘাত ও স্বরভঙ্গীসহ কবিতা আবৃত্তি, গল্প বলা এবং অভিনয় করতে পারা	কণ্ঠস্বরে যথাযথ উত্থানপতন-সহ কবিতা আবৃত্তি, গল্প বলা এবং গান গাইতে পারা
২) সহজভাবে পরিবারের সকলের ও সঙ্গীদের সঙ্গে কথা বলতে পারা	পারিবারিক পরিবেশের বাইরে ও বড়দের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারা	স্থানীয় প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারা	স্পষ্টভাষায় ঘোষণা ও নির্দেশ দিতে পারা
৩) স্বাভাবিক পরিবেশে বাচনিক সৌজন্য-ভদ্রতা প্রকাশের অনুশীলন	শ্রেণীকক্ষে গল্প বা ছোটখাট বিষয়ে অল্পবিস্তর কথা বলার অনুশীলন	গৃহে এবং বিদ্যালয়ে অতিথি অভ্যাগতদের সঙ্গে সৌজন্যমূলক কথা-বার্তা—যেমন স্বাগত বিদায় বা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে পারা	বিভিন্ন ধরণের সামাজিক পরিস্থিতিতে আলাপ-আলোচনা করতে পারা
৪) ব্যক্তিগত চাহিদা এবং প্রয়োজনের কথা বুঝতে পারা, সহজ তথ্যাদির আদান-প্রদান করতে পারা	ছোটখাট গল্প বা টুকিটাকী বিষয়ে বলতে পারা	শুদ্ধভাবে গঠিত বিষয়ের প্রশ্নোত্তর দিতে পারা	স্থানীয় প্রাসঙ্গিক বিষয়ে যুক্তিসঙ্গতভাবে কথা বলতেপারা। নিজের মতামত দিতে পারা
৫) সঙ্গী-সাথী এবং বড়দের কথার উত্তর সহজ এবং শুদ্ধভাবে দিতে পারা	অভিজ্ঞতাকে সহজে প্রকাশ করতে পারা। ঘটনা বা গল্প শুনে ছোট বাক্যে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারা	পঠিত বিষয় সহজভাবে বর্ণনা করতে পারা	দেখা, শোনা, পড়ার বিষয়ে সংক্ষেপে ও যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারা

সামর্থ্য ঃ পঠন

(১) বিভিন্ন ধরণের মুদ্রিত বিষয়—যেমন, ছবির বই, গল্পের বই, পাঠ্যপুস্তক, রাস্তাঘাটের পথনির্দেশ, বিজ্ঞাপন প্রভৃতি উপলব্ধিসহ পড়তে পারা

(২) শুদ্ধ উচ্চারণ, যথাযথ শ্বাসাঘাত, স্বরভঙ্গী এবং সাবলীলতার সঙ্গে পড়তে এবং আবৃত্তি করতে পারা

(৩) নীরবে এবং দ্রুততার সঙ্গে পড়তে পারা

(৪) আনন্দ এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য পড়তে পারা

(৫) হাতে লেখা বিষয়বস্তু পড়তে পারা

ক্রম ঃ এক/দুই	তিন	চার	পাঁচ
ধ্বনির সঙ্গে বর্ণের সংযোগ-সাধন। বর্ণ এবং শব্দগুলি চিনতে পারা	পথনির্দেশ, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি পড়তে পারা—ছোট ছোট বাক্যে লেখা অনুচ্ছেদ পড়ে ঘটনা, তথ্য আয়ত্ত করা	ছোট গল্প, কবিতা, বর্ণনামূলক রচনাদি পড়তে পারা এবং নতুন শব্দ চেনা। প্রাসঙ্গিক অর্থ উপলব্ধি করতে পারা	বিভিন্ন ধরণের বিষয় পড়তে পারা—লেখকের মতামত উপলব্ধি করতে পারা—নিজস্ব অভিমত গঠন করতে পারা
সহজ বাক্য পঠন শুদ্ধ উচ্চারণসহ বর্ণ, শব্দ এবং বাক্য পড়তে পারা	সহজপাঠ্য বিষয়ের অন্তর্গত ঘটনা, ভাব, অনুভূতি ইত্যাদির পারস্পরিক সম্পর্ক অনুধাবন করতে পারা	কোনো কিছু পড়ে ঘটনা, ভাব, অনুভূতির থেকে প্রাসঙ্গিক অর্থ অনুমান করতে পারা	অভিধান ও সূচীপত্র দেখতে শেখা—হাতে লেখা চিঠি পড়তে পারা
	পাঠ্যবইয়ের বাইরেও সহজ ছোট গল্প, রচনা পড়তে পারা	→	→
	সাবলীলতার সঙ্গে নীরব পঠন	→	→
	শিক্ষক ও সঙ্গীদের হাতের লেখা পড়তে পারা	→	→

সামর্থ্য ঃ লিখন

(১) স্পষ্ট পরিচ্ছন্নভাবে যথাযথ বিরাম চিহ্নসহ শুদ্ধতার সঙ্গে লিখতে পারা

(২) অভিজ্ঞতার বিবরণ লিখতে পারা

(৩) কোনো ঘটনার সহজ বর্ণনা লিখতে পারা

(৪) চিঠি এবং আবেদন পত্রাদি লিখতে পারা

ক্রম ঃ এক/দুই	তিন	চার	পাঁচ
যথাযথ আকারে বর্ণ এবং শব্দ লিখতে পারা	সুন্দর পরিচ্ছন্ন অক্ষরে শব্দ ও বাক্যের মধ্যবর্তী যথাযথ দূরত্ব রক্ষা করে বাক্য লিখতে পারা	পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে পরস্পর অর্থ-যুক্ত কয়েকটি বাক্য শুদ্ধভাবে লিখতে পারা	ব্যক্তিগত ভাব, অনুভূতি, অভিজ্ঞতা প্রকাশ করে লিখতে পারা
শুদ্ধ বানানসহ শব্দ লিখতে পারা	যথাযথ যতি, পূর্ণচ্ছেদ প্রভৃতি বিরাম চিহ্নসহ লিখতে পারা	আবেদনপত্র, দিনলিপি লিখতে পারা	সহজ গল্প, অনুচ্ছেদ প্রভৃতি নিজের ভাষায় লিখতে পারা
শুদ্ধভাবে কয়েকটি সহজ বাক্য লিখতে পারা	প্রাসঙ্গিক শব্দ ব্যবহার করে শুদ্ধ বাক্যের সাহায্যে কোনো ঘটনার বর্ণনা করতে পারা	ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে, পরিচিত বিষয়ে লিখতে পারা	চিঠি, আবেদনপত্র, দিনলিপি লিখতে পারা
			দেওয়াল পত্রিকা রচনা করতে পারা

উল্লিখিত চারটি প্রধান দক্ষতা ছাড়াও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিম্নলিখিত সামর্থ্যগুলির বিকাশের জন্য যথোপযুক্ত কার্যক্রম থাকা দরকার। তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণী থেকে এই সকল সামর্থ্যের বিকাশের জন্য প্রয়াস নেওয়া যেতে পারে।

লেখায় মৌলিকতা আনয়ন ঃ

শিক্ষার্থী তার লেখার মধ্যে নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিকে যথাযথ আবেগ ও কল্পনাসহ যাতে প্রকাশ করতে পারে তার জন্য প্রবন্ধ, গল্প, কথোপকথন, চিঠিপত্র ইত্যাদি লিখতে বলা যেতে পারে।

মাতৃভাষায় সাহিত্যের আস্বাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি ঃ

এই সামর্থ্যটির বিকাশের জন্য শিক্ষার্থীদের ঘটনার যথার্থতা বিচার করতে দেওয়া, সৌন্দর্যময় অংশ খুঁজে বের করতে বলা, শব্দ ও অন্যান্য প্রয়োগগত সৌন্দর্য ধরতে বলা যেতে পারে।

মাতৃভাষা ও সাহিত্যপাঠে আগ্রহ বৃদ্ধি ঃ

এজন্যে পাঠ্যপুস্তকের বাইরে অন্যান্য বই পড়ায় উৎসাহ দেওয়া, বিভিন্ন ধরণের কবিতা মুখস্থ করতে বলা, বিদ্যালয়ের বিবিধ সাহিত্য-ধর্মী কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ করতে বলা যেতে পারে।

সুস্থ ও কাম্য দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধ গড়ে তোলা ঃ

মাতৃভাষা বাংলা পঠন-পাঠনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বদেশ, পরিবেশ-পরিজন সম্বন্ধে যেন সুস্থ ও কাম্য দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। এজন্যে সত্যবাদিতা, আন্তরিকতা, উৎসাহ-উদ্দীপনা, নেতৃত্ব, স্বনির্ভরতা, শ্রমনিষ্ঠা, সহানুভূতি, ধৈর্য্য, সততা, নিরপেক্ষতা, আত্মবিশ্বাস, সমাজসেবা প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষার্থীকে সচেতন করে তোলা যেতে পারে।

বৃহদায়তন শ্রেণীতে পঠন-পাঠন

শ্রীআলোক মাইতি

ভূমিকা :

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ প্রায়ই বৃহদায়তন শ্রেণী থেকে উদ্ভূত সমস্যার উল্লেখ করেন। সম্ভবতঃ এরকম বিশ্বাস থেকেই উল্লেখ করেন যে, শ্রেণীর আয়তন ছোট হলে অর্থাৎ শিক্ষার্থীর সংখ্যা যত কম হবে ততই প্রতিটি শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষক ব্যক্তিগত মনোযোগ দেবার সুযোগ পাবেন, ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের পঠন-পাঠনও ভাল হবে।

প্রশ্ন হল, শ্রেণীর আয়তন কি রকম হলে তাকে পঠন-পাঠনের পক্ষে আদর্শজনক বলা যাবে? আবার বিষয়ভেদে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কি ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে? আর্থিক অবস্থার কথা বিবেচনা করলে শ্রেণীপিছু শিক্ষার্থীর সংখ্যা বর্তমান অপেক্ষা আরও কমানো সম্ভব বলে মনে হয় না। কারণ ছোট ছোট শ্রেণী করতে হলে আরও বেশী শ্রেণীকক্ষ এবং শিক্ষক প্রয়োজন—যার কোনোটিই বর্তমানে সম্ভব হবে না। তাহলে এমন একটা কিছু উপায় খুঁজে বের করতে হবে যাতে করে বৃহদায়তন শ্রেণীর থেকে যেসব অসুবিধা দেখা দেয় সেগুলিকে কিছুটা কমানো যায়।

সমস্যার স্বরূপ :

শ্রেণীতে বহুসংখ্যক শিক্ষার্থী থাকলে নিম্নলিখিত রূপ সমস্যাগুলি দেখা দিতে পারে—

(১) সকল শিক্ষার্থীর প্রতি ব্যক্তিগত মনোযোগ দেওয়া যায় না

(২) শিক্ষকের পরিশ্রম বেশী হতে পারে

(৩) অপেক্ষাকৃত দুর্বল এবং মেধাবী ছাত্রদের চাহিদা মেটানো যায় না

(৪) শিক্ষার্থীদের শিখনের মূল্যায়নের অসুবিধা

(৫) শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের বারবার অনুশীলন ও অভ্যাসের সময় দেওয়া যায় না

(৬) সবগুলি শিখন-উদ্দেশ্য পরিপূরণ করা যায় না

(৭) বাড়ীর কাজ দেখা সম্ভব হয় না

(৮) বহুসংখ্যক শিক্ষার্থীকে পরিচালনা করতে হলে সহজেই শারীরিক ক্লান্তি এবং তার থেকে মানসিক বিরক্তি আসতে পারে।

(৯) শিক্ষার্থীর পক্ষে বিশৃঙ্খল হওয়ার সুযোগ থাকে

(১০) কিছুসংখ্যক ছাত্রছাত্রী ক্লাস-পালানোর সুযোগ নেয়

(১১) অনেক শিক্ষার্থীর মধ্যে কোন কোন শিক্ষার্থী ব্যক্তিগতভাবে অবহেলিত মনে করতে থাকে

(১২) শিক্ষক-শিক্ষার্থীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করা যায় না।

এছাড়াও বিদ্যালয়-গৃহের যে সমস্যা রয়েছে তার ফলেও বৃহদায়তন শ্রেণী পরিচালনা খুবই অসুবিধা-জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে।

বৃহদায়তন শ্রেণী :

কাকে বৃহদায়তন শ্রেণী বলা যাবে তা নিয়ে সর্বসম্মত কিংবা বিজ্ঞানসম্মত তেমন কোনো মতামত নাই। এক দশকের-ও আগে জাতীয় শিক্ষা গবেষণা প্রশিক্ষণ সংস্থার উদ্যোগে পরিচালিত একটি পর্যালোচনা থেকে জানা যায় মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কোনো শ্রেণীতে ত্রিশজনের বেশী ছাত্রছাত্রী থাকলে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোনো শ্রেণীতে পঁচিশের বেশী ছাত্রছাত্রী থাকলে তাকে বৃহদায়তন শ্রেণী বলার পক্ষে শিক্ষক/পরিদর্শকগণ মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। আবার ব্যবহারিক বা বিজ্ঞানের শ্রেণীর পক্ষে এই সংখ্যাকে পনের বলা হয়েছে।

বাস্তব অবস্থা :

বৃহদায়তন শ্রেণী সম্পর্কে বিতর্ক যাই থাক না কেন বাস্তব অবস্থা কি সেটা বিবেচনা করে দেখা দরকার। ভারত সরকারের প্রদত্ত "নির্বাচিত শিক্ষা পরিসংখ্যান ১৯৭৮-৭৯" পুস্তিকা থেকে জানা যাচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সারা ভারতের শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত হল ১ : ৪০ এবং অন্ধ্র ও উত্তর প্রদেশ রাজ্যে এই হার হল ১ : ৪৯। সামগ্রিকভাবে ভারত এবং অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত বেশকিছু কম। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই হার হল ১ : ৩৬, প্রকৃতপক্ষে আরও দশটি রাজ্য আছে যেখানে শিক্ষক-ছাত্রের এই অনুপাত পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় বেশী।

কি করা সম্ভব :

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক-ছাত্রের যে অনুপাত বর্তমানে রয়েছে অদূর ভবিষ্যতে সেটা কমানো সম্ভব হবে না। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য এই সংখ্যা বরং আরও বাড়তে পারে—বিশেষতঃ শহরাঞ্চলে। এবং এটাও বিবেচ্য অন্যান্য সমৃদ্ধ দেশের মতো বিদ্যালয়-গৃহের ভাল ব্যবস্থা করা, শ্রেণীকক্ষে বিশেষ ধরণের আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করা, বিষয় অনুসারে শ্রেণীকক্ষের ব্যবস্থা করা, শ্রেণীকক্ষ বড় হলে শিক্ষার্থীদের বসবার ব্যবস্থা উন্নততর করা, বিভিন্ন ধরণের শিক্ষা-উপকরণ ব্যবহারের সুযোগ নেওয়া প্রভৃতি কোনোটাই পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খুব শীঘ্র সম্ভব হবে না।

বস্তুতঃপক্ষে বাস্তবক্ষেত্রে শিক্ষাপদ্ধতিগত দিকে কিছু রূপান্তর ঘটিয়ে উৎসাহী ও উদ্যোগী শিক্ষক

বহুসংখ্যক শিক্ষার্থী সমন্বিত শ্রেণীর ক্ষেত্রেও অধিকতর সাফল্য লাভ করতে পারেন। পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুসারে সাধ্যমত নিম্নলিখিত পন্থাগুলি অবলম্বন করা যেতে পারে—

(১) আগে থেকেই শ্রেণীর কাজের মোটামুটি পরিকল্পনা করে রাখা—এতে করে শ্রেণীতে ব্যক্তিগতভাবে কোনো শিক্ষার্থীর চাহিদার জন্য কম সময় দিলেও চলবে।

(২) সকল ছাত্রকে দেখতে পান এবং ছাত্রদের বসবার জায়গার মধ্যে গিয়েও যাতে পরিদর্শন করা যায় সেদিকে নজর রাখা।

(৩) শিক্ষার্থীদের সবসময় সক্রিয় রাখা—প্রশ্ন করে বা লেখার কাজ দিয়ে।

(৪) ব্ল্যাকবোর্ড থাকলে এবং অন্যান্য কোনো উপকরণ থাকলে সেগুলি যত বেশী সম্ভব ব্যবহার করা।

(৫) শিক্ষক প্রদত্ত ইঙ্গিতসূত্র অনুসারে ছাত্রছাত্রীদের স্ব-শিখনে উৎসাহিত করা।

(৬) যত বেশী সম্ভব দলগত কাজের বা শিখনের ব্যবস্থা করা।

যতটা সম্ভব এক ধরণের (homogeneous group) ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ছোট ছোট দল করা যায়। এক ধরণের বলতে এই সব শিশুদের মোটামুটি এক ধরণের আগ্রহ, একই এলাকার বাসিন্দা বা সাধারণ বুদ্ধি-উপলব্ধি প্রভৃতি যাদের কাছাকাছি সেসব ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে দল করা যায়। প্রত্যেক দলেই অপেক্ষাকৃত দুটি-একটি ভাল ছেলেমেয়ে থাকবে।

শ্রেণীতে বিভিন্ন বিষয় পঠন-পাঠনে সবার উদ্দেশ্যানুযায়ী দলের পুনর্বিন্যাস করে নিলে শ্রেণী-পরিচালনার সুবিধা হতে পারে। দলভাগের ফলে দলের সঙ্গীদের মধ্যে একদিকে যেমন একটা 'দায়িত্ববোধের' অনুভূতি বাড়ে তেমনি তাদের মধ্যে একটা সুস্থ প্রতিযোগিতার জন্য উদ্দীপনারও সৃষ্টি হতে পারে। শ্রেণীকক্ষে কোনো বিষয় পঠন-পাঠনের সময় নানা ভাবেই এই দলকে শিক্ষক মহাশয় কাজে লাগিয়ে শিখন পরিবেশ রচনা করতে পারেন—দলের মধ্যে পরস্পরকে সহায়তা করবার উৎসাহ বাড়ানো যায়, ভাল ছেলেদের নেতৃত্বে অন্যান্যদের অনুশীলন হয়। প্রয়োজন মতো অপেক্ষাকৃত দুর্বল শিক্ষার্থীর দিকে শিক্ষকের অতিরিক্ত মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয়, প্রয়োজনীয় সংশোধনধর্মী কাজ করার সুবিধা হয়। দলের ভাল ছেলেটির কাজ শিক্ষক দেখে দেবার পর সে অন্য ছেলেদের সহায়তা করতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের দল বিভাজন এবং তাদের স্ব-শিখনে উৎসাহিত করে তোলার দ্বারাই বৃহদায়তন শ্রেণীর থেকে যেসব সমস্যা দেখা দেয়—তার বেশ কিছুটা দূর করা সম্ভব হতে পারে।

---

*প্রয়োজন মতো জাতীয় শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সংস্থার বই-পত্রাদির সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গণিত-শিক্ষাদানে কয়েকটি মৌল ক্ষমতা বিকাশের উপায়

শ্রীসুধাংশুশেখর সেনাপতি

ভূমিকা :

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় গণিত শুধুমাত্র কতকগুলি বিমূর্ত সংখ্যা নিয়ে কারিগরি নয়, গণিত আজ শিক্ষার প্রতিটি শাখার জ্ঞান ও তত্ত্বের সুনির্দিষ্ট মাননির্ভর বাস্তব প্রয়োগে গণতান্ত্রিক সমাজের উপযুক্ত সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশসাধনে, বৈজ্ঞানিক যুক্তিশীল মনোভাব গঠনে, সমাজ-কল্যাণকর কাজে সহযোগিতার মনোভাব গঠনে এবং সর্বোপরি সৃজনাত্মক উৎপাদনশীল কাজের সংগে সম্যক পরিচিতি লাভে সাহায্য করবে।

উপরোক্ত বিষয়গুলির উপর দৃষ্টি রেখে প্রাথমিক স্তরে গণিত শিক্ষায় শিশুদের মধ্যে কতকগুলি মৌল ক্ষমতা অর্জনের সুযোগ আছে। মৌল ক্ষমতাগুলি হল—

(১) প্রয়োজনীয় গাণিতিক মূল ধারণাগুলির সুস্পষ্ট জ্ঞান অর্জন।

(২) দ্রুত ও নির্ভুল হিসাব করার ক্ষমতা।

(৩) দ্রুত ও নির্ভুল পরিমাপের ক্ষমতা।

(৪) গাণিতিক ভাষাবোধ।

(৫) গাণিতিক ভাষা থেকে প্রতীকে এবং প্রতীক থেকে গাণিতিক ভাষায় রূপান্তরের ক্ষমতা।

(৬) আবিষ্কারধর্মিতা এবং যুক্তি, বিচারশক্তি এবং সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা।

(৭) অনুমানের ক্ষমতা।

কিন্তু সুদীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখতে পাই, গতানুগতিক এবং অনাকর্ষণীয় শিক্ষাপদ্ধতির ফলে গণিত শিক্ষা সম্পূর্ণ যান্ত্রিক হয়ে পড়ে। ফলে শিশুরা গণিতে আগ্রহবোধ করে না —প্রাত্যহিক জীবনে আনন্দ পায় না, পুস্তককেন্দ্রিক জ্ঞানসর্বস্ব হয়ে পড়ে। গতি সম্বন্ধে বহু সমস্যার সমাধান করতে পারলেও, ব্যবহারিক জীবনে রাস্তা পার হ'তে গিয়ে গাড়ী-চাপা পড়ে। পুস্তককেন্দ্রিক জ্ঞানকে যদি ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগের কৌশল আয়ত্ত করে থাকে, তাহলে রাস্তা পার হওয়ার সময় গাড়ীর গতি এবং দূরত্ব হিসাব করে নিয়ে স্থির করে নিতে পারবে—গাড়ীটি ঐ দূরত্বে পৌঁছাতে যে সময় লাগবে তার পক্ষে ঐ সময়ের মধ্যে রাস্তা পার হওয়া সম্ভব কিনা। গণিত শিক্ষা হবে বাস্তব অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক এবং ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগের কলাকৌশলগুলি যাতে আয়ত্ত করতে পারে সেদিকে নজর

দিতে হবে। গণিতের মৌল ক্ষমতাগুলি আয়ত্ত করতে পারলে শিশুরা গণিতের উপযোগিতা বুঝতে পারবে এবং সমস্যা সমাধানের আনন্দে গণিত বিষয়ে উৎসাহবোধ করবে।

(১) গাণিতিক মূল ধারণাগুলির সুস্পষ্ট জ্ঞান অর্জন:

গণিতে মৌল ক্ষমতাগুলির মধ্যে প্রথম এবং প্রধান হ'ল—প্রয়োজনীয় গাণিতিক মূল ধারণাগুলির সুস্পষ্ট জ্ঞান অর্জন। ধারণাগুলি সুস্পষ্ট না হ'লে পরবর্তী পর্যায়ে আসবে বিফলতা। তাই শিক্ষকদের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য হবে গণিত শিক্ষার ক্ষেত্রে মূল ধারণাগুলির জ্ঞান শিশুদের কাছে সুস্পষ্ট করে দেওয়া।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫-৬ বছরের শিশু গণিত সম্বন্ধে নির্দিষ্ট কোন জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা না নিয়ে এলেও নিজস্ব পরিবেশের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে কয়েকটি মৌলিক ধারণা যেমন, কম-বেশী, লম্বা-খাটো, বড়-ছোট, হাল্কা-ভারী, এমনকি ১, ২, ৩····· ইত্যাদি সংখ্যাগুলির অস্পষ্ট ধারণা নিয়েই আসে। এই অভিজ্ঞতালব্ধ অস্পষ্ট মৌলিক ধারণাগুলিকে শিক্ষক মহাশয় ক্রমে গাণিতিক সংখ্যা ও পরিমাণগত ধারণায় পর্যবসিত করবেন।

সংখ্যার ধারণা:

পরিবেশ অনুযায়ী সহজলভ্য এবং অভিজ্ঞতার সংগে যুক্ত কিংবা সহজেই অভিজ্ঞতা দেওয়া যায় এমন সব বস্তুর সাহায্যে সংখ্যার ধারণা স্পষ্ট হ'তে পারে। শিশু তার শরীরের বিভিন্ন অংশের সংগে নিশ্চয়ই পরিচিত। শিক্ষক শিশুর মাথা, নাক, মুখ ইত্যাদি দেখিয়ে একটি মাথা, একটি নাক, একটি মুখ ···· এইভাবে 'এক' সংখ্যার সংগে পরিচিত করাবেন। দুইটি হাত, দুইটি পা, দুইটি কান ইত্যাদি দেখিয়ে 'দুই' সংখ্যার সংগে পরিচিত করাবেন। অনুরূপভাবে 'তিন' থেকে 'নয়' সংখ্যার পরিচিতির জন্য দেশলাই-এর কাঠি, ঝাঁটা বা পাটকাঠি, তেঁতুলের বীচি, গুলি, চক ইত্যাদির সাহায্য নিতে পরেন।

সংখ্যা লেখা:

১ থেকে ৯ সংখ্যার ধারণা পরিষ্কার হলে সংখ্যার বিমূর্ত রূপ অর্থাৎ সংখ্যা লেখার অভ্যাস সৃষ্টি করতে হবে। নির্দিষ্ট সংখ্যক বস্তুর ছবি, সংখ্যার লিখিত রূপ এবং কথায় সংখ্যাটি লিখে বারবার অভ্যাস করলে সংখ্যার বিমূর্তরূপ তাদের কাছে বিমূর্ত থাকবে না। ৫ (পাঁচ) সংখ্যাটি লিখলেই সংগে সংগে তাদের মনে ৫টি বস্তুর ছবি এবং ৩ (তিন) সংখ্যাটি লিখলেই ৩টি বস্তুর ছবি মনে আসবে। শুধু তাই নয়, ৫ এবং ৩-এর মধ্যে সম্পর্ক অর্থাৎ কোন্‌টি বড়, কোন্‌টি ছোট এবং কত বড় বা কত ছোট—এ পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবে।

সংখ্যার স্থানিক মান :

দশক পদ্ধতিতে সংখ্যা লেখা শেখার জন্য দশ দশ করে সংখ্যা গণনা করতে শেখাতে হবে। জিনিষগুলি (যেমন, পাটকাঠি, ঝাঁটাকাঠি ইত্যাদি) দশ দশ করে এক-এক আঁটি করবে। তারপর দশক, একক ঘর কেটে দশকের আঁটির সংখ্যা দশকের ঘরে এবং খুচরো জিনিষের সংখ্যা এককের ঘরে লিখে সংখ্যাগুলি পড়তে শিখবে। এই লেখা শেখার সময় দশক এবং এককের ঘরের সংখ্যার অর্থ পরিষ্কার বুঝতে পারবে। একই সংখ্যা ৫ এককের ঘরে থাকলে ৫ বোঝাবে, কিন্তু দশকের ঘরে থাকলে ৫০ বোঝাবে। শুধু তাই নয়, কোনো ঘরে কিছু না থাকার অর্থ শূন্য (০) অর্থাৎ শূন্যের স্থানিক মানেরও ধারণা পরিষ্কার হবে।

দশক	একক	সংখ্যার রূপ	পড়া	সংখ্যা (কথায়)
⋕	×	১০	এক দশ এ	দশ
⋕	|	১১	এক দশ এক	এগার
⋕	‖	১২	এক দশ দুই	বার
⋕ ⋕	×	২০	দুই দশ এ	কুড়ি
⋕ ⋕	‖	২২	দুই দশ দুই	বাইশ

লব্ধ শিক্ষাকে বারবার প্রয়োগ করার সুযোগ দিতে হবে। পাটকাঠি অথবা ঝাঁটাকাঠিকে দশ দশ করে কয়েকটি আঁটি এবং কিছু আলগা করে রাখবে। শিশুকে বাইশ সংখ্যাটি দেখাতে বললে সংগে সংগে দুটি দশের আঁটি আর দুটি কাঠি দেখাবে। প্রতি শিশুকে এ্যাবাকাশ শ্লেট কিনতে বলা যেতে পারে। তাহলে এ্যাবাকাশের সাহায্যে সংখ্যা সম্বন্ধে ধারণা পরিষ্কার হবে। ভালভাবে শেখার জন্য বেশ কিছুদিন ধরে বারবার গণনা করতে এবং তা লিখিতভাবে প্রকাশ করতে শেখাতে হবে। পরে দশটি দশকের আঁটি একসঙ্গে বেঁধে শতকের আঁটি এবং আরও পরে হাজারের আঁটির ধারনা দিয়ে হাজার, শতক, দশক এবং এককের ঘরের সংখ্যার স্থানিক মান অনুযায়ী সংখ্যাগুলি পড়তে এবং লিখতে শিখবে। সংগে সংগে তিন বা চার অংকের দুটি সংখ্যার তুলনা অর্থাৎ বড়, ছোট না সমান তা নির্ণয় করতে শেখাতে হবে।

যোগ ও বিয়োগের ধারণা :

সংখ্যা সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণার জন্য মৌখিকভাবে যোগ ও বিয়োগ শিখবে। পাঁচটি কাঠি আর তিনটি কাঠি নিয়ে একসঙ্গে মিলিয়ে গুণে দেখবে মোট আটটি কাঠি হয়েছে। আবার পাঁচটি কাঠি নিয়ে তা থেকে তিনটি কাঠি সরিয়ে নিয়ে গুণে দেখবে বাকী দুটি কাঠি আছে। প্রথম প্রক্রিয়াকে 'যোগ'

অর্থাৎ কিছু যুক্ত করা এবং দ্বিতীয় প্রক্রিয়াকে 'বিয়োগ' অর্থাৎ কিছু বাদ দেওয়া বোঝায়। বিশেষ অর্থে যোগকে counting forwards বা সামনের দিকে গণনা এবং বিয়োগকে counting backwards বা পিছনের দিকে গণনা বোঝায়। এই যোগ-বিয়োগের ধারণা পরিষ্কার করার জন্য কাঠির আঁটির অথবা এ্যাবাকাশের সাহায্য নিয়ে বারবার অভ্যাস করবে। এমনকি, শ্রেণীতে দুইজন করে এক-একটি দল করে একজন সংখ্যার সমস্যা এবং অপরজন সমাধান করবে। প্রতিযোগিতারও ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সমস্যার সমাধান করতে পারলে এক পয়েন্ট আর না পারলে শূন্য। প্রথমে ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা এবং পরে দলগত প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এই প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করতে পারলে দলের মধ্যে প্রতিটি শিশুর শেখবার আগ্রহ সৃষ্টি হবে। শুধু সমস্যা সমাধানের উপায় নয়, অন্য দলকে ঠকাবার মত সমস্যা সৃষ্টি করতেও শিখবে।

গুণ ও ভাগের ধারণা ঃ

যোগ ও বিয়োগের ধারণা দৃঢ়বদ্ধ হলে একই সংখ্যা বারবার যোগ করার সমস্যা তুলে ধরে কি করে সহজে তা করা যায় তার উপায় হিসাবে গুণ প্রক্রিয়া উপস্থাপিত করতে হবে। অনুরূপভাবে বারবার বিয়োগ করার সমস্যাকে কি করে সহজে তা করা যায় তার উপায় হিসাবে ভাগ-প্রক্রিয়া শেখাতে হবে। মনে রাখতে হবে এ ধারণাগুলি দেওয়ার সময়ও তাদের ব্যবহৃত জিনিষপত্রের, কাঠির অথবা এ্যাবাকাশের সাহায্য নিতে হবে। ধারণা পরিষ্কার হলে সংখ্যারূপ নিয়ে অভ্যাস করবে।

নামতার ব্যবহার ঃ

ক্রমে সংখ্যার আকার বড় হলে তখন নামতার প্রয়োজন হবে। এই প্রয়োজন দেখা দিলে শিশুরা নিজেরাই নামতা তৈরী করবে, শিক্ষক মহাশয় কৌশলটি শিখিয়ে দেবেন মাত্র। তবে নামতা মুখস্থ করার জন্য যেন চাপ না দেওয়া হয়। প্রথম প্রথম নামতা দেখে দেখেই সমস্যা সমাধানের সুযোগ দিতে হবে। যখন অনুভব করবে, নামতা মুখস্থ করলে পরিশ্রম কম হবে এবং সময়ের সাশ্রয় হবে তখন শিশুরা নিজের প্রয়োজনেই নামতা মুখস্থ করবে।

বিভিন্ন এককের ধারণা ঃ

যথাসময়ে দৈর্ঘ্য ও ওজনের একক উপস্থাপনার পর লম্বা-খাটো, ভারী-হাল্কা প্রভৃতি মৌলিক ধারণাগুলিকে পরিমাপনির্ভর গাণিতিক ধারণায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। যে দশক পদ্ধতিতে সংখ্যা গণনা শিখেছে সেই দশক পদ্ধতিতেই দৈর্ঘ্য ও ওজন প্রভৃতির পরিমাপের একক নির্ধারিত হয় বলেই সংখ্যা গণনার শতক, দশক, একক ইত্যাদির স্থানাঙ্ক অনুসারে দৈর্ঘ্য, ওজন প্রভৃতির এককাবলী সাজিয়ে খুব সহজেই দৈর্ঘ্য ও ওজন সম্পর্কিত যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ এবং লঘুকরণ প্রক্রিয়াগুলিও সহজেই

শিখতে পারবে। অনুরূপভাবে টাকা-পয়সার হিসাবও শিখতে পারবে। সময় নির্ণয়ের এককগুলি দশমিক পদ্ধতিতে নয় বলেই প্রথমে কিছুটা সমস্যায় পড়বে। কিন্তু পিচ্‌বোর্ডের একটি ঘড়ি তৈরী করে ঘন্টা ও মিনিটের কাঁটা বিভিন্ন অবস্থায় রেখে সময় নির্ণয়ের পদ্ধতি শিখিয়ে দলভাগ করে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করলে খুব দ্রুত শিখতে পারবে। বার, তারিখ এবং মাসের হিসাব অভ্যাসের জন্য শ্রেণীতে বোর্ডে এবং তাদের খাতায় প্রতিদিন বার এবং তারিখ লেখার অভ্যাস করলে সপ্তাহের বিভিন্ন বারগুলির নাম, মাসের নাম এবং কোন্ মাসে কতদিন তা অতি সহজেই শিখতে পারবে—মুখস্থ করাবার কোনো প্রয়োজন নেই। পরে প্রচলিত ছড়াটি—"তিরিশ দিনেতে হয় মাস সেপ্টেম্বর ; সেইরূপ এপ্রিল, জুন আর নভেম্বর। আটাশ দিনেতে সবে ফেব্রুয়ারী ধরে, বাড়ে তার একদিন চতুর্থ বছরে। আর সব মাস হয় একত্রিশ দিনে, এইরূপে ..... ।"

ভগ্নাংশ ও দশমিকের ধারণা ঃ

নীচের তিনটি ছবির সাহায্য নিয়ে সহজেই ভগ্নাংশ এবং দশমিকের ধারণা দেওয়া যেতে পারে।

$\frac{১}{৮}$	$\frac{১}{৮}$	$\frac{১}{৮}$	$\frac{১}{৮}$
$\frac{১}{৮}$	$\frac{১}{৮}$	$\frac{১}{৮}$	$\frac{১}{৮}$
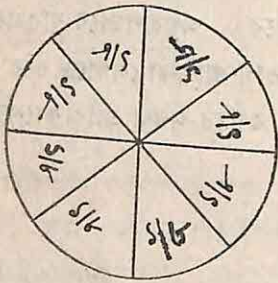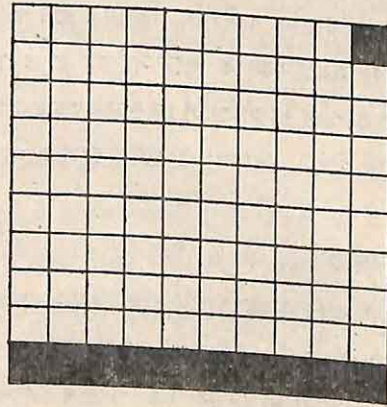
পূর্ণ সংখ্যা

কাগজে ঐরকম দুটি ছবি এঁকে একটির ছোট ছোট অংশগুলি কেটে নিয়ে যোগ, বিয়োগ, গুণ ইত্যাদি শিখতে পারবে এবং মিলিয়ে নিতে পারবে। এমনকি ভাগের সময় কেন ভগ্নাংশের হরকে লব এবং লবকে হর করে যে ভগ্নাংশ হয় ভাজ্যকে তাই দিয়ে গুণ করতে হয় সে ধারণাও জন্মাবে।

$১ \div \frac{১}{২} = ১ \times \frac{২}{১} = ২$ অর্থাৎ ১কে $\frac{১}{২}$ দিয়ে ভাগ মানে ২ দিয়ে গুণ।

$১ \div \frac{১}{৪} = ১ \times \frac{৪}{১} = ৪$ অর্থাৎ ১কে $\frac{১}{৪}$ দিয়ে ভাগ মানে ৪ দিয়ে গুণ।

$১ \div \frac{১}{৮} = ১ \times \frac{৮}{১} = ৮$ অর্থাৎ ১কে $\frac{১}{৮}$ দিয়ে ভাগ মানে ৮ দিয়ে গুণ।

তৃতীয় ছবিটি থেকে পূর্ণ সংখ্যা, দশাংশ এবং শতাংশের ধারণা পরিষ্কার হবে এবং প্রত্যেকটির সংগে সম্বন্ধ বুঝতে পারবে। তারপর দশমিকের যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ শিখবে। পরে গুণের সময় কেন

গুণক ও গুণ্যের দশমিক বিন্দুর পরের অংকের সংখ্যাগুলির যোগফলের পর (ডান দিক থেকে) দশমিক বিন্দু বসাতে হয় সে বিষয়ে ধারণা হবে।

$$১\text{·}২ \times ৩ = ১\frac{২}{১০} \times \frac{৩}{১০} = \frac{১২}{১০} \times \frac{৩}{১০} = \frac{৩৬}{১০০} = \text{·}৩৬$$

অন্যান্য বিষয়ঃ

গণিতের অন্য বিষয়গুলিও যেমন, গড়, ল. সা. গু. ও গ. সা. গু., ঐকিক নিয়ম, শতকরা, সুদ নির্ণয় ইত্যাদি শেখাবার সময় সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের প্রাত্যহিক কাজ ও বাস্তব সমস্যার সংগে যুক্ত করে অবতারণা করলে শিশুরা শেখার জন্য আগ্রহবোধ করবে এবং সহজেই বুঝতে পারবে।

জ্যামিতির ধারণাঃ

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতে জ্যামিতি সম্বন্ধে ধারণা দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। আমার মনে হয়, কিছু পূর্বে শুরু করলেও অসুবিধা হবে না। বলা বাহুল্য জ্যামিতিক আকার সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণাই দেওয়া হবে, সংজ্ঞা প্রকরণ শিখবে না—ব্যবহারিক ভাবেই উদ্দিষ্ট ধারণা লাভ করবে। বাস্তব ঘনবস্তুর সাহায্যে তল, সমতল, অসমতল, বক্রতল প্রভৃতির ধারণা সৃষ্টি করতে হবে। টেবিল, বোর্ড, ঘরের মেঝে ইত্যাদির তলকে সমতল এবং বলের, গ্লোবের তলকে বক্রতল বলা হয়—এ ধারণা সহজেই পাবে। একটি সোজা রেখা টেনে তার নাম যে সরলরেখা এবং বাঁকা রেখা টেনে তার নাম যে বক্ররেখা তা শিখবে। শুধু তাই নয়, রেখা হতে হলে যে তা মোটা হলে চলবে না এ বোধও তাদের দিতে হবে। এমনি ভাবেই ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, আয়তক্ষেত্র, বর্গক্ষেত্রের জ্যামিতিক আকারের ধারণা পাবে। পিচ্ বোর্ড কেটে অথবা সাদা কাগজে বিভিন্ন প্রকারের জ্যামিতিক আকারের চিত্র আঁকতে পারে। শুধু তাই নয়, একটি আয়তক্ষেত্র বা বর্গক্ষেত্রকে কোণাকুণি ভাবে একটি রেখা টেনে যে দুটি সমান ত্রিভুজে পরিণত করা যায় এবং তার ক্ষেত্রফল সম্পূর্ণ ক্ষেত্রটির অর্ধেক তা তারা নিজেরাই আবিষ্কার করবে।

ছক-কাগজ (Graph Paper) ব্যবহার করে তার উপর আয়তক্ষেত্র, বর্গক্ষেত্র এঁকে ছকের ছোট ঘরগুলি গুণে গুণে তার ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পারবে। পরে জানতে পারবে—আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = দৈর্ঘ্যের একক × প্রস্থের একক এবং বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = (বাহুর দৈর্ঘ্যের একক)^{২}

(২) দ্রুত ও নির্ভুল হিসাব করার ক্ষমতাঃ

প্রক্রিয়া-পদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে পরিষ্কার ধরণা হলেই শিশুরা হিসাব করতে পারবে। কিন্তু কারও কম সময় আবার কারও বেশ বেশী সময় লাগে। হিসাব শুধু নির্ভুল নয়, দ্রুততার সংগে করতে হবে।

পরীক্ষায় একটা নির্দিষ্ট সময়ে বেশ কয়েকটি অংক করতে হয়। দ্রুত এবং নির্ভুল হিসাব করতে না শিখলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সব অংক নির্ভুলভাবে করতে পারবে না। তাই প্রক্রিয়া-পদ্ধতিগুলি শেখার পর অভ্যাসের সুযোগ দিতে হবে। পাঠ্যপুস্তকে যেসব অংক দেওয়া থাকে তা নমুনা হিসাবে দেওয়া হয়। শিক্ষক মহাশয় ঐরকম আরও অংক তৈরী করে শিশুদের অভ্যাসের জন্য দিবেন। শ্রেণীর মধ্যে দলগত প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা থাকলে শিশুরা নিজেরাই নূতন নূতন অংক তৈরী করে নিতে পারবে।

(৩) দ্রুত ও নির্ভুল পরিমাপের ক্ষমতা :

পরিমাপের প্রক্রিয়া-পদ্ধতিগুলি শেখার সঙ্গে সঙ্গে তার অভ্যাস সৃষ্টিও করতে হবে। মিটার-সেন্টিমিটার দিয়ে পরিমাপ শেখার পর শ্রেণীতে, এমনকি বাড়ীতে হাতের কাছে যা পাওয়া যায়, যেমন বই, খাতা, শ্লেট, বোর্ড, টেবিল, ঘরের মেঝে, জানালা-দরজা, শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের উচ্চতা ইত্যাদি পরিমাপ করে দেখবে। এই অভ্যাসের ফলে দ্রুত এবং নির্ভুল পরিমাপের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। অনুরূপ-ভাবে গ্রাম-কিলোগ্রাম দিয়ে ওজনের পরিমাপ শেখার পর পিচ্‌বোর্ড দিয়ে অথবা অ্যালুউমিনিয়ামের বাটি দুটিতে দড়ি দিয়ে একটি সরল লাঠির দুই প্রান্তে বেঁধে এবং লাঠির মাঝখানে ছিদ্র করে দড়ি দিয়ে ধরার ব্যবস্থা করে একটা দাঁড়িপাল্লা তৈরী করে এবং দোকান থেকে বাটখারা এনে ইট ভেঙ্গে অথবা ছোট বড় পাথরকে বিভিন্ন ওজনের বাটখারা করে হাতের কাছে যা পাওয়া যায় সেগুলি পরিমাপ করতে করতে দ্রুত এবং নির্ভুল পরিমাপের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

(৪) গাণিতিক ভাষাবোধ :

এমনও দেখা যায়, একটি শিশু যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি প্রক্রিয়াগুলি খুব ভালভাবেই করতে পারে। কিন্তু সমস্যার আকারে অংক দেওয়া থাকলে কোনো কোনো বিশেষ শব্দের অর্থ বুঝতে না পারার জন্য কোন্ প্রক্রিয়ায় অংকটি করতে হবে বুঝতে না পেরে অংকটি করতে পারল না। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখার মত গণিতেও যে ভাষার স্থান আছে এবং তা না শিখলে গণিতের ধারণা পরিষ্কার হয় না—এ ধারণা তাদের দিতে হবে। যেমন, মোট, সমষ্টি, একত্রে, যোগফল ইত্যাদি বোঝাতে যোগ বোঝায় এবং বাদ, বিয়োগ, অন্তর, বেশী-কম বোঝাতে বিয়োগ বোঝায়। গণিতে এরকম অজস্র শব্দ বা ভাষা আছে যার অর্থ না বুঝলে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। শুধু শব্দ বা ভাষা নয়, প্রত্যেকটি প্রতীক চিহ্নের অর্থও বুঝতে হবে। গাণিতিক ভাষাবোধের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াগুলির (যেমন, যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ) নির্ভুল হিসাব শেখার পর প্রতিটি অংক সমস্যার আকারে দিতে হবে। সমস্যাটি বারবার পড়ে শিশু চিন্তা করবে কোন্ প্রক্রিয়া প্রয়োগ করতে হবে এবং কেন? প্রথম প্রথম বেশ সময় লাগবে, কিন্তু বিশেষ বিশেষ শব্দের অর্থ বুঝতে শিখলে পরে খুব সহজেই

করতে পারবে। মনে রাখতে হবে শিশুকে চিন্তার সুযোগ দিতে হবে এবং যেখানে শিশু কোনমতেই পারছে না, কেবলমাত্র সেখানে শিক্ষক মহাশয় ব্যাখ্যা করে দিবেন কোন্ প্রক্রিয়া এবং কেন হচ্ছে।

(৫) গাণিতিক ভাষা থেকে প্রতীকে এবং প্রতীক থেকে গাণিতিক ভাষায় রূপান্তরের ক্ষমতা ঃ

এই ক্ষমতাটি গাণিতিক ভাষাবোধের ক্ষমতার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। গাণিতিক ভাষাবোধের ক্ষমতা বৃদ্ধি হলে সাধারণ ভাষায় প্রকাশিত সমস্যাকে গাণিতিক প্রতীক চিহ্নে এবং সম্ভবক্ষেত্রে গাণিতিক চিহ্নে প্রকাশিত সমস্যাকে সাধারণ ভাষায় প্রকাশ করার অনুশীলন বারবার করতে হবে। ১২কে ৩ দ্বারা গুণ করে ৪ দ্বারা ভাগ বলতে (১২ × ৩) ÷ ৪ বোঝাবে ১২ × (৩ ÷ ৪) বোঝাবে না। আবার ১৫ ÷ (৩ + ২) বলতে ১৫কে ৩ ও ২-এর যোগফল দ্বারা ভাগ বোঝাবে, ১৫কে ৩ দিয়ে ভাগ + ২ বোঝাবে না।

(৬) আবিষ্কারধর্মিতা এবং যুক্তি, বিচারশক্তি ও সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা ঃ

এই ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রথম পদক্ষেপ সমস্যার আকারে অংকের উপস্থাপনা, প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াগুলির নির্ভুল হিসাব শেখার পর সমস্যার আকারে অংক দিলে সমস্যাটি বারবার পড়ে শিশু চিন্তা করবে কোন্ প্রক্রিয়া প্রয়োগ করতে হবে এবং কেন? প্রথম প্রথম বেশ সময় লাগলেও পরে অভ্যাসের ফলে খুব সহজেই করতে পারবে। মনে রাখতে হবে শিশুর চিন্তা এবং বিচারশক্তির বিকাশসাধন করতে হবে। যেখানে শিশু কোনমতেই পারছে না, কেবলমাত্র সেখানে শিক্ষক মহাশর ব্যাখ্যা করে দিবেন, কোন্ প্রক্রিয়া এবং কেন হচ্ছে। অভ্যাসের ফলে সমস্যা সমাধানে প্রকৃষ্ট প্রক্রিয়া-পদ্ধতি নিরূপণের কাজ নিজে নিজেই করতে পারলে সমস্যা সমাধানের আনন্দ, আবিষ্কারধর্মিতা ও উদ্ভাবনী শক্তির উন্মেষ ঘটাবে।

শ্রেণীতে দলগত প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা থাকলে একটি দল অপর দলকে সমস্যা সমাধানের জন্য দেবে এবং অপর দলের সমস্যার সমাধান করবে। সমস্যা সৃষ্টি তখনই সম্ভব যখন প্রক্রিয়া-পদ্ধতি সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা গড়ে উঠবে। এতে করে প্রক্রিয়া-পদ্ধতি সম্বন্ধে কতটা শিখতে পেরেছে তার তাৎক্ষণিক মূল্যায়নের কাজও হবে। এইভাবে গাণিতিক ধারণা স্পষ্ট ও দৃঢ় হবে, আত্মবিশ্বাস বাড়বে এবং সর্বোপরি তারা যে নিজেরাই সমস্যা আবিষ্কার করতে পারে, এই অভিজ্ঞতা তাদের আবিষ্কারধর্মিতা ও উদ্ভাবনী শক্তির উন্মেষ ঘটাবে।

ছক-কাগজে আয়তক্ষেত্র ও বর্গক্ষেত্র এঁকে ছক-কাগজের ছোট ছোট ঘরগুলি গুণে আয়তক্ষেত্র ও বর্গক্ষেত্রের পরিমাপ বা ক্ষেত্রফল নির্ণয় করবে। কয়েকটি ক্ষেত্রের পরিমাপ করতে করতেই তাদের অনুসন্ধিৎসার ফলে বুঝতে পারবে—আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = দৈর্ঘ্যের একক × প্রস্থের একক এবং

বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = (বাহুর দৈর্ঘ্যের একক)^{২}। অভ্যাসের ফলে এও বুঝতে পারবে যে, আয়তক্ষেত্র বা বর্গক্ষেত্রের বিপরীত কোণগুলি যোগ করলে দুটি সমান ত্রিভুজের সৃষ্টি হবে এবং তাদের ক্ষেত্রফল = $\frac{১}{২}$ ভূমির বাহু × উচ্চতা।

(৭) অনুমানের ক্ষমতা ঃ

অভ্যাসের ফলে এককালে আমার নিজের অনুমানের ক্ষমতা এমনই ছিল যে, একটি ঘর, একটি জমির আয়তন দেখেই বলে দিতে পারতাম। শুধু তাই নয়, রাত্রিতে ঘুম থেকে জেগে উঠে ক'টা বেজেছে বলে দিতে পারতাম। গণিতের ক্ষেত্রে অনুমানের ক্ষমতার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে।

সাধারণভাবে ভাগ করার সময় ভাজ্য এবং ভাজকের সংখ্যা একটু বেশী হলে (অর্থাৎ শেখা নামতার বেশী) কতবার ভাগ যাবে তা নির্ণয় করার জন্য শিশুরা ১ বার, ২ বার··· ৯ বার পর্যন্ত গুণ করে থাকে। এতে পরিশ্রম এবং সময়ও লাগে অনেক বেশী। কিন্তু অনুমানের ক্ষমতা থাকলে সাধারণভাবে ২ বারের বেশী গুণ করতে হয় না। এই অনুমান করার কৌশলটি তাদের শিখিয়ে দিতে হবে। ভাজ্যের প্রথম অংককে ভাজকের প্রথম অংক দিয়ে ভাগ করা গেলে (না করা গেলে ভাজ্যের প্রথম দুটি অংক ধরে নিতে হবে) তাহলে কতবার যায় তা দেখতে হবে (নামতার সাহায্যে)। ঐ সংখ্যা দিয়ে সমস্ত ভাজককে গুণ করলে, গুণফল ভাজ্যের চেয়ে বেশী হলে সংখ্যাটির আগের সংখ্যাটি হবে নির্দিষ্ট ভাগফল। কম হলে পরের সংখ্যাটি দিয়ে ভাজককে গুণ করে দেখে নিতে হবে তা ভাজ্যের চেয়ে বেশী বা কম হয়েছে। যত বড়ই ভাগ হোক না কেন দু'বারের বেশী গুণ করতে হবে না। একটি কথা মনে রাখতে হবে—ভাজকের দ্বিতীয় অংকটি ৬ বা ৭-এর বেশী হ'লে প্রথম অংকের সংখ্যার সঙ্গে ১ যোগ করে নিলে সুবিধা হবে।

অনেক সময় অমনোযোগী ছাত্রদের মধ্যে দেখা যায়—একটি বিয়োগ করতে গিয়ে বিয়োগফল বিয়োজ্যের চেয়ে বেশী হয়ে গেল। কিন্তু ছাত্রটির অনুমান করার ক্ষমতা থাকলে ভুল কোথায় তা বুঝতে পারবে। বিয়োজ্যের বামদিকের সংখ্যা থেকে বিয়োজকের বামদিকের সংখ্যা বাদ দিলে যা হবে মূল বিয়োগফলের ঐ স্থানের সংখ্যা তার থেকে বেশী কখনই হতে পারে না বরং হয় সমান হবে অথবা ১ কম হতে পারে।

অনুরূপভাবে গুণের ক্ষেত্রে গুণফলের অংকের সংখ্যা গুণ্যের ও গুণকের অংকের সংখ্যার যোগফলের সমান অথবা ১ কম হবে, কখনই বেশী হবে না। আবার ভাগের ক্ষেত্রে ভাগফলের অংক ভাজ্য ও ভাজকের অংকের বিয়োগফলের সমান অথবা ১ বেশী হবে, তার বেশী বা কম হবে না।

পরিমাপের ক্ষেত্রে শিশুরা প্রথমে অনুমান করে পরে প্রকৃত পরিমাপ করে মিলিয়ে নিতে পারে। প্রথম দিকে অনুমান এবং প্রকৃত পরিমাপের মধ্যে বেশ পার্থক্য থাকলেও অভ্যাসের ফলে ঐ পার্থক্য কমে আসবে এবং অনুমান করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

উপসংহার :

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাবে, আমরা একটু চেষ্টা করলেই শিশুদের কাছে গণিতকে ভয়ের বিষয় থেকে আনন্দের বিষয় করে তুলতে পারি। সংগে সংগে গণিতের প্রক্রিয়াগুলির ধারণা স্পষ্ট করতে ও প্রক্রিয়া সম্পাদনে কুশলতা অর্জনে আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারি। প্রাথমিক স্তরে এইভাবে গণিত সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারলে ও প্রক্রিয়া সংক্রান্ত ধারণাকে স্পষ্ট করতে পারলে তা শিশুর গণিত শিক্ষার বলিষ্ঠ ভিত্তি রচনা করবে।

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার প্রসার
কয়েকটি তথ্য

১। পশ্চিমবঙ্গের ৯৫ শতাংশ ভাগ বসতির ১ কি. মি. মধ্যে ১টি বিদ্যালয় আছে।

২। ৫ হাজার রীতি-নিরপেক্ষ (Non-formal) শিক্ষাকেন্দ্র আছে।

৩। ৯ হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৩০ লক্ষ ছাত্রছাত্রী পড়ছে।

৪। ১ হাজার উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ও ২৫০টি কলেজে ১ লক্ষ ছাত্রছাত্রী পড়ছে।

৫। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩৫ লক্ষ ছাত্রছাত্রী খাবার পাচ্ছে।

৬। সমস্ত তপশিলী জাতি ও উপজাতির ছাত্রীকে ও শতকরা ৪০ভাগ অন্য ছাত্রীকে পোষাক দেওয়া হচ্ছে।

৭। বর্তমান সরকারের আমলে ৮,৫০০ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নতুন বাড়ী হয়েছে।

৮। দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া বিনা বেতনে হচ্ছে।

৯। সমস্ত স্বীকৃত বিদ্যালয় পূর্ণ সরকারী সাহায্যের আওতায় এসেছে।

১০। বর্তমান সরকারের সময়ে বিদ্যালয়হীন গ্রাম ও আদিবাসী-তপশিলী অধ্যুষিত এলাকায় ৪৬০০টি বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।

["পশ্চিমবঙ্গ" ২৬শে জুন ১৯৮১ সংখ্যায় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীপার্থ দে মহাশয়ের প্রবন্ধ থেকে।]

প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম ঃ
রাজ্য পরিক্রমা

শ্রীআলোক মাইতি

পশ্চিমবঙ্গে এ বছর থেকে প্রাথমিক শিক্ষার একটি নতুন শিক্ষাক্রম চালু হয়েছে। স্বাভাবিক কারণেই শিক্ষকগণ শিক্ষাক্রমের অন্তর্গত নানান বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইছেন।

ইংরাজী কেন তুলে দেওয়া হল—এ প্রশ্ন যেমন তাঁদের অনেকের, তেমনি পাশ-ফেল না থাকলে বিদ্যালয়ে আদৌ পঠন-পাঠনের আবহাওয়া আর থাকবে কিনা সে বিষয়েও অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করছেন।

অনেকে আবার বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের অন্যান্য সমস্যা নিয়ে ভাবিত—কেননা এগুলোর সমাধান না হলে শিক্ষাক্রম বিদ্যালয়ে অনুসরণ করাই নাকি অসম্ভব ব্যাপার। এসবের মধ্যে আছে বিদ্যালয়গৃহের সমস্যা, একক-শিক্ষক বিদ্যালয়ের সমস্যা, একেকটা শ্রেণীতে অনেক ছাত্রের সমস্যা। এছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষকদের দক্ষতার অভাবের সমস্যা তো আছেই।

সমস্যা হয়ত অদূর ভবিষ্যতে দূর হবার নয়, কিন্তু একাকী পথ চলতে হচ্ছে বলে যে নিঃসঙ্গতার ক্লান্তি, অন্যদের কথা না জানার জন্যে যে সমস্যা-অসুবিধাগুলিকে পর্বতপ্রমাণ দেখাচ্ছে তা হয়ত কিছুটা দূরীভূত হতে পারে—যদি ভারতের অপরাপর রাজ্যের সহস্র সহযোগী শিক্ষক কোন্ পরিবেশে কাজ করছেন তার কিছু কিছু চিত্র আমরা লক্ষ্য করি।

এটাও স্মরণে রাখতে হবে—ভারতের শিক্ষার জন্য যে সহায়সম্পদ আগামী ষষ্ঠ পঞ্চবর্ষীয় পরিকল্পনায় বরাদ্দ হতে চলেছে তাতে এটা স্পষ্ট হয়েছে—হাজার হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গৃহ-সমস্যার সমাধানে তেমন কিছু সরকারী সহায়তা সম্ভব হবে না, সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে শ্রেণীগুলিতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়বে অথচ সে তুলনায় শিক্ষক নিয়োগ করা সম্ভব হবে না।

প্রকৃতপক্ষে স্থানীয় সর্বশ্রেণীর জনগণের উৎসাহ এবং সহায়তাকে সার্থকভাবে কাজে লাগিয়ে বিদ্যালয়ের সমস্যাবলীর কিছুটা সমাধান হয়ত হতে পারে—আর এ কাজে শিক্ষক মহাশয়কেই এগিয়ে যেতে হবে।

পরিস্থিতিটা যখন এরকমই তখন ভারতের অন্যান্য রাজ্যের কিছু কিছু খবর এ রাজ্যের শিক্ষকদের কাছে আকর্ষণীয় মনে হতে পারে সেজন্যে কিছু কিছু তথ্য দেওয়া হল—

১. প্রাথমিক স্তর ঃ

ভারতের খুব কম সংখ্যক রাজ্যেই চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক স্তর। অধিকাংশ রাজ্যে—যেমন

অন্ধ্র, গুজরাট, কর্ণাটক, কেরল, উড়িষ্যা, রাজস্থান, তামিলনাড়ু প্রভৃতি রাজ্যে ৭ম বা ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক (উচ্চ প্রাথমিকসহ) স্তর বিস্তৃত।

২. সাধারণ উদ্দেশ্য :

অধিকাংশ রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্য মোটামুটি এক হলেও কিছু কিছু রাজ্যে স্বতন্ত্রতাও লক্ষ্য করা যায়। যেমন—গুজরাটে সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধি অন্যতম উদ্দেশ্য। হরিয়ানা চায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে সত্যের প্রতি ও নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ, দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিবেশকে উপলব্ধি, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠুক। কর্ণাটক আবার শারীরশিক্ষা, কর্মশিক্ষা, নীতিশিক্ষা, স্বাস্থ্য অভ্যাস ইত্যাদি বেশী জোর দিতে চায়। অন্যদিকে কেরল শিক্ষার্থীদের সমাজ-দেশের অগ্রগতিতে অংশগ্রহণের উপযোগী করে তুলতে, শিশুদের মধ্যে সৌন্দর্যবোধের বিকাশ ঘটাতে চায়। মধ্যপ্রদেশ চায় শিশুরা যেন বাস্তব সমস্যা ও তার সমাধানে উৎসাহী হয়।

৩. বিষয় :

কোনো কোনো রাজ্যের শিক্ষাক্রমে প্রচলিত সাধারণ বিষয়বস্তুর বাইরে অন্যান্য কিছু কিছু বিষয় অন্তর্গত।

অন্ধ্রপ্রদেশে শারীরশিক্ষা, শিল্পকলা, সংগীত, হোম সায়েন্স, নীতিশিক্ষাও শিখতে হয়। কর্ণাটকে তো পপুলেশন এডুকেশন, নীতিশিক্ষা, শরীরচর্চা আবশ্যিক। বিহারেও ড্রয়িং, সঙ্গীত, শরীরচর্চা ও কর্ম অভিজ্ঞতা আছে। মহারাষ্ট্রেও শরীরচর্চা, কর্মশিক্ষা, কলা, শিল্প, সঙ্গীত গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়ে আছে। তামিলনাড়ুতে শরীরচর্চা, নীতিশিক্ষা শিক্ষাক্রমের অন্যতম দুটি বিষয়।

৪. ভাষা :

বেশ কয়েকটি রাজ্যে একাধিক ভাষা শিখতে হয়। এগুলির মধ্যে আছে অন্ধ্র (হিন্দী বা তেলেগু) ; বিহার (মাতৃভাষা, রাষ্ট্রভাষা, সংস্কৃত) ; কেরল—মালয়ালাম (সংস্কৃত, ফ্রেঞ্চও শোনা যায়), যে কোন হিন্দীও আবশ্যিক ; মধ্যপ্রদেশে ৪র্থ পর্যন্ত একটি ভাষা থাকলে পরে তিনটি ভাষা শিখতে হয় ; মহারাষ্ট্রে—মাতৃভাষা, হিন্দী ; চণ্ডীগড়—হিন্দী, পাঞ্জাবী।

ইংরাজী

ভারতের অন্যান্য রাজ্যে প্রাথমিক স্তরে বিভিন্ন শ্রেণী থেকে ইংরাজী ভাষাও শিখতে হয়। এগুলির মধ্যে—৩য় শ্রেণী থেকে ইংরাজী আছে মণিপুর, গোয়া দমনদিউ, তামিলনাড়ুতে ;

৪র্থ শ্রেণী থেকে ইংরাজী আছে ত্রিপুরা, কেরল (দ্বিতীয় ভাষারূপে)

৫ম শ্রেণী থেকে ইংরাজী আছে বিহার, মহারাষ্ট্রে ;

৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ইংরাজী আছে অন্ধ্র, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, গুজরাট (ঐচ্ছিক), মেঘালয় (গ্রামের বিদ্যালয়ে)।

৫. পাঠ্যবই/শিক্ষকের সহায়ক বই :

বহু রাজ্যেই প্রাথমিক স্তরে সরকারীভাবে পাঠ্যবই দেবার ব্যবস্থা আছে। শিক্ষকদের জন্য গাইড

বইও কোথাও কোথাও দেওয়া হয়। হরিয়ানাতে গণিত ছাড়া সব পাঠ্যবই এন সি ই আর টি প্রকাশিত বই। কেরলে আবার শিক্ষা অধিকর্তার দপ্তর থেকে মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

৬. শিক্ষক :

ভারতের অন্যান্য রাজ্যের এক বিশাল সংখ্যক বিদ্যালয়গুলি একজন মাত্র শিক্ষক পরিচালিত। শিক্ষাক্রমের বিভিন্ন বিষয়ের জন্য যথাযথ বৃত্তিগত যোগ্যতার অভাবও বিদ্যমান। বিশেষতঃ বিজ্ঞান, অঙ্ক, শরীরচর্চার শিক্ষকের দিক থেকে।

৭. শ্রেণীতে আটক না রাখার নীতি :

পশ্চিমবঙ্গের নতুন প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রমে শ্রেণীতে আটকে না রাখার সিদ্ধান্তটি নতুন হলেও এ ব্যবস্থা ভারতের বহু রাজ্যে অনেক আগে থেকেই চালু আছে এবং বেশ সন্তোষজনক ফলও পাওয়া যাচ্ছে। এগুলির মধ্যে অন্ধ্র, হরিয়ানা, কর্ণাটক, কেরল, মেঘালয়, রাজস্থান, তামিলনাড়ুতে কোথাও বা ২য় বা ৩য়, বা ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত এই ব্যবস্থা আছে। ভবিষ্যতে আরও উঁচু শ্রেণী পর্যন্ত এটা চালু করার কথাও ভাবা হচ্ছে।

৮. গণ-উদ্যোগ :

প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম রূপায়ণে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে চলাটা যে বাস্তব দিক থেকে একান্ত অপরিহার্য এবং তা নিলে যে বহু অসুবিধা বা সমস্যার পুরোপুরি না হলেও অনেকখানি সমাধান যে করা যায় তা ভারতের বহু রাজ্যের শিক্ষা প্রশাসক এবং শিক্ষকগণ উপলব্ধি করেছেন। সেজন্যে তারা প্রয়োজন মতো নানা ধরণের কার্যক্রমও নিয়ে থাকেন। এগুলির মধ্যে তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, মহীশূর, মধ্যপ্রদেশ এবং কর্ণাটকের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কোনো কোনো রাজ্যে শিক্ষক-অভিভাবক সংস্থার সাহায্যেও বিবিধ অসুবিধা অতিক্রমের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

তামিলনাড়ুর "School improvement Programme"-এর সাহায্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য জিনিষপত্রাদিসহ ১২ কোটিরও বেশী অর্থ সংগ্রহ হয়েছে। প্রতি দু'বছর অন্তর বিদ্যালয়গুলির অসুবিধা এবং চাহিদাগুলি জেনে নিয়ে যথাযথভাবে জনসংযোগের মাধ্যমে তা সমাধানের চেষ্টা হয়।

মহীশূর রাজ্যেও "School betterment Programme" খুব সাড়া জাগিয়েছে।

আর মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলায় যে শিবিরগুলি অনুষ্ঠিত হয় তাতো রীতিমত উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী। একেক গ্রামে একটি বিদ্যালয়ে স্থানীয় বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকগণ (ছাত্রেরাও), ঐ গ্রামের জনগণ মিলিত-ভাবে সপ্তাহের ১টি শনিবার এবং রবিবার সম্মি'লত হয়ে বিদ্যালয়ের বিবিধ প্রসঙ্গে আলোচনা করেন—জিনিষপত্র সংগ্রহ করেন।

*উৎস : "কারিকুলাম ইন্ ট্রানজাক্শান"—এন. সি. ই. আর. টি.

প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণ শিক্ষাক্রমের পুনর্বিন্যাস

শ্রীনিমাইদাস দত্ত

স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক ও নিম্নবুনিয়াদী শিক্ষার পরিবর্তিত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ১৯৬৯ সালে নিম্নবুনিয়াদী শিক্ষক শিক্ষণ শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী রচনা করা হয়েছিল। তারপর দু'দশক অতিক্রান্ত হয়েছে। মুষ্টিমেয় নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গে কয়েক হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বহু শিক্ষক-শিক্ষিকা নিম্নবুনিয়াদী শিক্ষক শিক্ষণ নেবার পর পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয়-গুলিতে কর্মরত। প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের বাস্তব অবস্থা ও সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ তাঁদের বৃত্তিগত প্রশিক্ষণকে কাজে লাগাতে গিয়ে যে বিবিধ ধরণের অসুবিধার সম্মুখীন হন সে কথা বারবার বলা হয়েছে। নিম্নবুনিয়াদী শিক্ষক শিক্ষণকে অধিকতর বাস্তবমুখী এবং কার্যকরী করবার প্রয়োজন অনুস্থৃত হয়েছে। তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়গুলির পুনর্বিন্যাস করার কথাও চিন্তা করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৮১ সাল থেকে একটি নতুন প্রাথমিক শিক্ষাক্রম প্রবর্তিত হয়েছে। নতুন প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম রূপায়ণে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের স্বল্পকালীন মেয়াদের 'ওরিয়েন্টশন' কার্যক্রমের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। যেহেতু এই ধরণের শিক্ষণ খুবই স্বল্প সময়ের জন্য তাই কর্মরত শিক্ষকদের নতুন শিক্ষাক্রমের সকল দিক সম্পর্কে স্বাভাবিক কারণেই বিস্তারিতভাবে জানানো সম্ভব নয়। কর্মরত শিক্ষক ছাড়াও বেশ কয়েক হাজার নতুন শিক্ষক প্রতিবছরই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাজে নিযুক্ত হন। বিশেষ করে এঁদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণের শিক্ষাক্রম নতুন করে পুনর্বিন্যাসের বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

নয়া প্রাথমিক শিক্ষাক্রম যে উদ্দেশ্যে রচনা করা হয়েছে, শিক্ষাক্রমে যে বিশেষ ধরণের দৃষ্টিকোণ এবং মূল্যবোধের উল্লেখ আছে, বিষয়বস্তু পদ্ধতি এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যে ধরণের নতুনত্ব আনা হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষক শিক্ষণ শিক্ষাক্রমের পুনর্বিন্যাস একান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

প্রকৃতপক্ষে প্রাথমিক শিক্ষার নতুন শিক্ষাক্রম প্রবর্তন বছরের (১৯৮১) প্রথম মাসেই এক সরকারী আদেশনামায় (Memo No. 40—Edu (P) dated 15. 1. 81) প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণের জন্য নয়া শিক্ষাক্রম সংগঠনের নির্দেশ ঘোষিত হয়। উক্ত বিজ্ঞপ্তি অনুসারে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ এবং প্রাথমিক শিক্ষাক্রম সিলেবাস কমিটির সভাপতি শ্রীহিমাংশুবিমল মজুমদার মহাশয়কে সভাপতি করে একটি কমিটিও গঠিত হয়।

: সময় পত্রিকা :

শ্রেণী/দিন	ঘণ্টা/সময়→		১২-৩৫/১২-৪০ বিরাম		১-৪৫/২-১০ বিরতি		
১ম/২য়	১১-/১১-১৫	১ ১১-১৫/১১-৫৫	২ ১১-৫৫/১২-৩৫	৩ ১২-৪০/১-১৫	৪ ১-১৫/১-৪৫	৫ ২-১০/২-৫০	৬ ২-৫০/৩-৩০
সোম	প্রার্থনা	মাতৃভাষা	গণিত	পরিবেশ পরিচিতি	প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা	স্বাস্থ্য, শারীরশিক্ষা ও খেলাধুলা	
মঙ্গল	”	”	”	”	সৃজনাত্মক কাজ	”	
ধ	”	”	”	”	প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা	”	
বৃহস্পতি	”	”	”	উৎপাদনাত্মক কাজ	সৃজনাত্মক কাজ	”	
শুক্র	”	”	”	”	”	”	
শনি	”	”	”	পুরাণো পাঠ/মূল্যায়ন	—	—	
৩য়/৪র্থ/৫ম							
সোম	”	”	”	ইতিহাস	প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা	উৎপাদনাত্মক কাজ	স্বাস্থ্য, শারীরশিক্ষা ও খেলাধুলা
মঙ্গল	”	”	”	”	সৃজনাত্মক কাজ	”	”
বুধ	”	”	”	বিজ্ঞান	উৎপাদনাত্মক কাজ	সৃজনাত্মক কাজ	”
বৃহস্পতি	”	”	”	ভূগোল	প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা	মাতৃভাষা	”
শুক্র	”	”	”	বিজ্ঞান	”	”	”
শনি	”	”	”	পুরাণো পাঠ/লিখন/মূল্যায়ন	—	—	—

বিষয় অনুসারে সময়ের পরিমাণ

	বিষয়	প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী	তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণী
(১)	মাতৃভাষা—	৬ × ৪০ মি: = ২৪০ মি:	৮ × ৪০ মি: = ৩২০ মি:
(২)	গণিত—	৬ × ৪০ মি: = ২৪০ মি:	৬ × ৪০ মি: = ২৪০ মি:
(৩)	স্বাস্থ্য, শারীরশিক্ষা ও খেলাধূলা—	৫ × ৪০ মি: = ২০০ মি:	৫ × ৪০ মি: = ২০০ মি:
(৪)	উৎপাদনাত্মক— সৃজনাত্মক কাজ—	২ × ৩৫ মি:, ৩ × ৩০ মি: } ১৬০ মি:	২ × ৪০, ১ × ৩০ } ১১০ মি:; ১ × ৪০, ১ × ৩০ } ৭০ মি: } ১৮০ মি:
(৫)	প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, পরিবেশ পরিচিতি	২ × ৩০, ৩ × ৩৫ } ১৬৫ মি: } ২৫৫ মি:	৩ × ৩০ = ৯০ মি: } ১৮০ মি:
	প্রার্থনা	৬ × ১৫ = ৯০ মি:	৩ × ৩০ = ৯০ মি:
(৬)	সাহিত্যসভা, প্রকল্প, অভিনয়, পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি—	৫৫ মি:	৫৫ মি:
(৭)	ইতিহাস		২ × ৩৫ = ৭০ মি: } ১৭৫ মি:
	ভূগোল		১ × ৩৫ = ৩৫ মি:
	বিজ্ঞান		২ × ৩৫ = ৭০ মি:
(৮)	লিখন—		৩৫ মি:

দ্রষ্টব্য

(১) প্রার্থনা :

সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে সমবেত সঙ্গীত, মহাপুরুষের বাণীপাঠ, খবর বলা/লেখা, ব্যক্তিগত-সামুদায়িক পরিচ্ছন্নতা, শ্রেণীসজ্জা প্রভৃতির কার্যক্রম থাকবে।

(২) মাতৃভাষা :

এজন্য প্রতিদিন ৪০ মি: বরাদ্দ আছে। তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীর জন্য তুদিন অতিরিক্ত ৪০ মি: বরাদ্দ আছে। এই ৪০ মি: সময়কে ২৫ + ১৫ বা ৩০ + ১০ মি: বিভক্ত করে নিয়ে মাতৃভাষার পাঠ্যবই পঠন-পাঠনের সঙ্গে সঙ্গে সপ্তাহের একেক দিনে—

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে—

(ক) কথোপকথন, (খ) গল্পবলা/শোনা, (গ) পরিচিত শব্দ সহজ বাক্য লিখন, (ঘ) অভিজ্ঞতা বলা/লেখা, (ঙ) ছড়া-কবিতা, (চ) লিখন অভ্যাস।

তৃতীয় শ্রেণীতে—

(ক) অভিজ্ঞতা বর্ণনা, (খ) কবিতাপাঠ, (গ) গল্প, (ঘ) দিনলিপি, (ঙ) শব্দ-খেলা, (চ) লিখন অভ্যাস।

(৪) বিদ্যালয়ে যেসব ছেলেমেয়ে যায় তাদের প্রতি ১০০ জনের মধ্যে ৬০ জনই পঞ্চম শ্রেণীর আগে এবং ৭৫ জন অষ্টম শ্রেণীর আগে বিদ্যালয় ছেড়ে দেয়। মেয়েদের মধ্যে এই সংখ্যা আরও বেশী। মেয়েদের মাত্র ৩০ জন পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত যায়।

(৫) স্বাধীনতার সময়ে ভারতে ১,৭৫,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ কোটি ৪০ লক্ষ-র মত ছেলেমেয়ে পড়ত। ১৯৭৯ সালের শেষে প্রায় ৫,০০,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (৫ম শ্রেণী পর্যন্ত) ৬ কোটি ৫০ লক্ষ ছেলেমেয়ে পড়ছে।

(৬) পশ্চিমবঙ্গের প্রায় অর্ধ লক্ষ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬১ লক্ষ ২৪ হাজার ৩০০ (ভূমিলক্ষী ৯ জুন ১৯৮০) ছেলেমেয়ে পড়ছে।

(৭) ১৯৫১ সালের সেন্সাসে সারা ভারতে সাক্ষরতায় পশ্চিমবঙ্গের স্থান ছিল দ্বিতীয়, ১৯৭১ সালের সেন্সাসে ত্রয়োদশ এবং ১৯৮১ সালের সেন্সাসে এটা হয়েছে ষোড়শ। মেয়েদের সাক্ষরতায় ভারতের মধ্যে সপ্তদশ স্থান (শতকরা ৩০%)।

অপর দিকে কেরালা ১৯৫১ সালের সেন্সাসের মত ১৯৮১ সালেও সাক্ষরতায় প্রথম স্থানে রয়েছে। মেয়েদের সাক্ষরতায় (৬৪%) ও কেরালা প্রথম স্থান দখল করে আছে।

(৮) স্বাধীনতার পঁচিশ বছর পরে জাতীয় আয়ের মাত্র শতকরা ৩ ভাগ শিক্ষার জন্য বরাদ্দ ছিল। ১৯৬৮ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে এটাকে যথাশীঘ্র বাড়িয়ে শতকরা ৬ ভাগ করবার কথা বলা হয়েছিল।

(স্বাধীনতার পঁচিশ বছর : শিক্ষা : প্রকাশন বিভাগ)

পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষার নতুন শিক্ষাক্রম :

৬—১৪ বছর বয়সী সব ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার যে সমস্যা, বিদ্যালয় পরিত্যাগজনিত যে অপচয় সমস্যা এবং একই শ্রেণীতে একাধিক বছর আটকে থাকার ফলে যে অবরোধ সমস্যা—এ সবের পটভূমিকায় "প্রাথমিক শিক্ষাকে আধুনিকীকরণ এবং বাস্তবমুখী করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে" পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে উদ্যোগ নেন তারই আন্তরিক ফলশ্রুতি-স্বরূপ প্রাথমিক শিক্ষার একটি নতুন শিক্ষাক্রম পাওয়া গেছে। শিক্ষার সঙ্গে সংযুক্ত বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তি ও সংগঠনের সম্মিলিত চিন্তাভাবনার ফসল এটি। ১৯৮১ সাল থেকে এর রূপায়ণ সুরু হয়েছে।

শিক্ষাক্রম সংগঠনের প্রাক্-ভাবনা :

এ রাজ্যের বিদ্যালয়ে যাবার বয়সী এমন সকল শিশুর কথা বিশেষ করে সমাজের দুর্বল অবহেলিত শ্রেণীর শিশুর প্রয়োজনকে স্মরণে রেখে "শিশুর সার্বিক বিকাশের প্রয়োজনের সঙ্গে বিকাশশীল সমাজের চাহিদাকে সমন্বিত করার" মূল লক্ষ্যকে সামনে রেখে "প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য সমূহকে বিস্তৃতভাবে নির্ধারণ" করার কথা শিক্ষাক্রম সংগঠনের সময় বিশেষভাবে মনে রাখা হয়েছে।

শিক্ষাক্রমের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য :

(১) "নতুন শিক্ষাক্রমে আধুনিকতম চিন্তাধারা গ্রথিত হয়েছে। সেইজন্য প্রাথমিক শিক্ষাকে শিশুর এবং সমাজের

সর্বোতোমুখী বিকাশের সহায়করূপে দেখা হয়েছে। তার ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ, ক্রান্তিকারী সমাজের উপযুক্ত নাগরিকতাবোধের সৃষ্টি, জীবনব্যাপী শিখনের প্রেরণা ও কর্মদক্ষতার উন্মেষকে লক্ষ্য হিসাবে ধরে নেওয়া হয়েছে।

(২) "শিক্ষাকে জীবনমুখী ও প্রয়োগধর্মী করার উদ্দেশ্যে শিশুর নিজ নিজ পরিবেশের উন্নতিকল্পে অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এবং সর্বোপরি বিভিন্ন বিষয়ের লব্ধ অভিজ্ঞতার সাঙ্গীকরণের জন্য "প্রত্যক্ষঅভিজ্ঞতামূলক কাজ" শীর্ষক কর্মমুখী পর্যবেক্ষণধর্মী একটি নতুন বিষয় পাঠক্রমে সংযোজিত হয়েছে।

(৩) "পাঠক্রমকে প্রয়োগসাধ্য, ব্যবহারধর্মী ও পরিবেশ অনুসারে প্রাসঙ্গিক ও নমনীয় করার উদ্দেশ্যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

(৪) "যুগোপযোগী কর্মক্ষম নাগরিক গড়ে তোলার জন্য উৎপাদনাত্মক ও সৃজনাত্মক কর্মের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং অনুসন্ধিৎসা, আবিষ্কারধর্মিতার ও পর্যবেক্ষণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।"

শিশুর শেখা :

যে কোনো শিশুই তার জীবন আর অভিজ্ঞার ভেতর দিয়েই শেখে। এটা সে বিদ্যালয়ের বাইরে থেকেও শিখতে পারে। কিন্তু এর ফলে অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়ও সে শিখতে পারে। কিন্তু "শিক্ষাক্রম" ব্যাপারটা তেমন নয়। এখানে যে সব অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে সে শেখে সেগুলো সবই পরিকল্পিত এবং নির্দেশিত।

আবার শিশুকে কেবল একজন "শিক্ষার্থী" (Learner) হিসাবে দেখলেই চলবে না। সে তো ভবিষ্যতে একজন পুরোপুরি "মানুষ" (Person) হয়ে উঠবে, সে তো আগামী দিনে সমাজের এক দক্ষ "কর্মী" (Worker) হয়ে উঠবে, সে তো দেশের ভাবী সুনাগরিক (Citizen) হয়ে উঠবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে নিছক কতকগুলো পুঁথিগত তত্ত্ব বা তথ্য আহরণ বা আয়ত্ত করে শিশু একজন পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে উঠতে পারে না। বস্তুতঃপক্ষে পুঁথিগত বিদ্যার জাহাজ হওয়া শিক্ষার উৎকর্ষতার "মান" (Standard) হতে পারে না। মগজকে কতকগুলো তথ্যের ভাণ্ডাররূপে গড়ে তুলে লাভ কি ?

এজন্যই শিক্ষাক্রমকে চাহিদাভিত্তিক (need based) আর জীবনকেন্দ্রিক (life centre) করে তোলার দরকার। আর এটা করার জন্য কর্ম-অভিজ্ঞতা, স্বশিখন, আবিষ্কার, পর্যবেক্ষণ ইত্যাদির এক সুসংহত পরস্পর সম্পৃক্ত কার্যক্রম প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে স্থানীয় প্রাকৃতিক-সামাজিক পরিবেশের- সঙ্গে যুক্ত করে শিখনের ব্যবস্থা করলে অভিভাবকগণ শিশুদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে উৎসাহবোধ করবেন এবং শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষার শেষ পর্যন্ত বিদ্যালয়ে রেখে দেবেন।

শিশুর শেখাটা চাহিদাভিত্তিক-জীবনকেন্দ্রিক হলে সাধারণ ধরণের বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে পাশ-ফেলও থাকবে না। কেননা প্রতিটি শিশু নিজ নিজ চাহিদা আর সামর্থ্য মতো শেখে এবং শিক্ষা-সোপানের সিঁড়িগুলো অতিক্রম করে পরবর্তী ধাপে উঠে যায়। শেখার বিষয়বস্তু আর পদ্ধতিটাই এমনভাবে পরিকল্পিত হবে যাতে শিক্ষার্থীর ক্রমিক অগ্রগতির তা সহায়ক হয়। ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং যথাযথ প্রগতিপঞ্জী রক্ষার দ্বারা এটা সুনিশ্চিত করা সম্ভব। শিক্ষাক্রমের সুপরিকল্পিত অভিজ্ঞতার সাহায্যে শিশুকে বিদ্যালয়ে ধরে রাখাও সম্ভব।

চতুর্থ শ্রেণীতে—

(ক) নীরব পঠন, (খ) শ্রুতলিখন, (গ) আবৃত্তি, (ঘ) প্রশ্নোত্তরের আসর, (ঙ) অভিনয়, (চ) অনুচ্ছেদ রচনা।

পঞ্চম শ্রেণীতে—

(ক) নীরব পঠন, (খ) শব্দ-খেলা, (গ) ব্যবহারিক ব্যাকরণ, (ঘ) সৃজনধর্মী রচনা লিখন অভ্যাস, (ঙ) অভিনয়, (চ) প্রশ্নোত্তর প্রভৃতির কার্যক্রমও থাকবে।

মাতৃভাষার অতিরিক্ত ঘণ্টা দুটিতে নীরব পঠন অনুশীলন, ইঙ্গিতসূত্র অনুসারে পঠন, অতিরিক্ত পাঠ্যবই পঠন, সৃজনধর্মী রচনা লেখার অভ্যাস প্রভৃতির পাঠদান করা যেতে পারে।

(৩) পরিবেশ পরিচিতি, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা :

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে—

পরিবেশ পরিচিতি ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ঘণ্টা পর পর আছে। প্রয়োজনবোধে এগুলি সংযুক্ত করে নিয়ে একটি এককরূপেও পাঠদান করা যেতে পারে। শুধু তাই নয় ভ্রমণ, পর্যবেক্ষণ ইত্যাদির প্রয়োজনে ঐ দুটি ঘণ্টার পরে যে বিরতি আছে সেটিকেও সুবিধামত কাজে লাগানো যেতে পারে। এই সময়ে সামাজিক দৃশ্যকল্প রচনা (যেমন ডাকঘর, হাট, রথের মেলা প্রভৃতি) বিভিন্ন চরিত্র অভিনয়ের (যেমন ডাক্তার/রোগী, বাস কণ্ডাকটর, ফেরিওয়ালা প্রভৃতি) ব্যবস্থা করা যায়।

তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম শ্রেণীতে—

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ঘণ্টাটি ইতিহাস/ভূগোল/বিজ্ঞানের পরে এবং বিরতির পূর্বে রাখার সুবিধা হল প্রয়োজনমত ঐ সকল বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত করে পাঠদান করা যাবে (যার প্রয়োজন হবেই) বা অতিরিক্ত কিছু সময়ের সুযোগ নেওয়াও সম্ভব হবে। এই সময়ে পর্যবেক্ষণমূলক কাজ (মাসে অন্ততঃ দু'দিন), স্থানীয় বিশিষ্ট লোকদের অভিজ্ঞতা শোনা (মাসে কমপক্ষে দু'দিন), আলোচনা/বিতর্কসভা, স্থানীয় সমস্যাদি প্রসঙ্গে (মাসে ১দিন) প্রভৃতির ব্যবস্থা করা যায়। জাতীয় উৎসব পালন, সমাজ সেবামূলক কাজ, জন্মদিন উদ্‌যাপন প্রভৃতির ব্যবস্থাও করা যায়। এ সম্পর্কে শিক্ষাক্রমে বিস্তারিত নির্দেশ আছে।

(৪) সৃজনাত্মক কাজ : এই সময়ে সঙ্গীত ও চিত্রাঙ্কনের ব্যবস্থাদি করা যেতে পারে।

(৫) প্রতি শনিবার তৃতীয় ঘণ্টায় পুরাণো পড়া ধরা, বিভিন্ন বিষয়ের পরীক্ষাদি নেওয়া যায়।

(৬) বিদ্যার্থী সভা/সাহিত্য সভা প্রভৃতি :

শনিবার চতুর্থ ঘণ্টা থেকে মোটামুটি একঘণ্টা সময়ের মধ্যে একেক শনিবার বিদ্যার্থীর আসর, সাহিত্যের আসর, দেওয়াল পত্রিকা রচনা, অভিনয় বা ছোট ছোট ভ্রমণ ইত্যাদির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কোন এক শনিবার শিক্ষক মহাশয়গণ বিদ্যালয়ের মাসিক, ত্রৈমাসিক কার্য পরিকল্পনার জন্যও ব্যবহার করতে পারেন।

(৭) প্রতিদিনই বিভিন্ন বিষয় পঠন-পাঠনের ঘণ্টাতে সুযোগমত পিছিয়ে পড়া শিশুদের জন্য বিশেষ পাঠ ও ব্যবস্থা করা দরকার।

হাতের লেখা শেখানো

শ্রীমতী আলপনা মাইতি

ছেলেবেলায় স্কুলের পরীক্ষায় যখন ফার্স্ট হতাম—বন্ধুরা প্রায়ই বলত—দিদিমণিরা তোকে তো বেশী নম্বর দেবেনই—তোর অমন মুক্তার মত লেখা। আমার হস্তলিপি এমন কিছু আহামরি ছিল না— আর বড় হয়ে এটাও বুঝেছিলাম—কেবল 'মুক্তার মতো' হাতের লেখার জোরে ফার্স্ট হওয়া যায় না। তবে আরো বড়ো হয়ে আমার দাদার অসাধারণ সুন্দর অলঙ্কৃত হাতের লেখা দেখে এটা অনুমান করেছিলাম—বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় যারা প্রথম হয় তাদের হাতের লেখাও সুন্দর হয়। পরে বি. এড্ পড়বার সময় স্কুলে পড়াতে গিয়ে লক্ষ্য করেছিলাম—যেসব ছাত্রছাত্রীর হাতের লেখা ভাল তাদের লেখা অধিকতর মনোযোগ দিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। শুধু তাই নয়, এও দেখেছিলাম যাদের হাতের লেখা সুন্দর তাদের আচার-ব্যবহার আর অন্যান্য কাজকর্মেও অধিকতর সৌন্দর্য রাখার যেন একটা প্রয়াস আছে।

এমন একটা সময় ছিল যখন পরা অপরা সকল বিদ্যাই ছিল শ্রুতিনির্ভর। গুরুর মুখ নিঃসৃত বাণী শিষ্য স্মৃতিতে ধরে রাখতেন—শিষ্যের কাছ থেকে আবার প্রশিষ্যে তা সঞ্চারিত হত। এরকমটা হবার কারণ হল—বর্ণমালার প্রচলন না থাকা।

কিন্তু আধুনিক সভ্যতার জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হয়ে উঠেছে বর্ণমালা তথা মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কারের ফলেই। আবার সুদূর অতীতে যেমনটি ছিল—গুরুপ্রদত্ত জ্ঞানকে লেখার মধ্যে ধরে রাখাই ছিল হাতের লেখার অন্যতম উদ্দেশ্য এখন আর তেমন নয়। প্রকৃতপক্ষে বিদ্যালয় আর বিদ্যালয়ের বাইরের জীবনে শিক্ষার্থীর হাতের লেখার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

শিশুর জীবনে হাতের লেখার ভূমিকা :

স্বাভাবিক শিশু-শিক্ষার্থী মাত্রই আত্মপ্রকাশে উন্মুখ। সে যখন বিদ্যালয়ের বাইরে থাকে তখন ও নানাভাবে লিখে নিজেকে প্রকাশ করতে চায়। যেমন—

সে তার উপহার পাওয়া জিনিষপত্রে নাম লিখতে চায়

সে তার আঁকা ছবির নাম দিতে চায়

ঘরে-বাইরের নানান খেলায় তাদের লিখতে হয়

সে বিভিন্ন কারণে নিমন্ত্রণ চিঠি লিখতে চায়

দূরের বন্ধু-আত্মীয়দের চিঠি লিখে খবর দিতে চায়

আবার শিশু যখন বিদ্যালয়ে থাকে তখনও—

শিশুকে নতুন নতুন শব্দ লিখতে হয়

পর্যবেক্ষণজাত সহজ সহজ বিষয় লিখে রাখে

শ্রেণীতে আলোচনার কথা লেখে

পরীক্ষায় বসে উত্তর লিখতে হয়

এটা দেখা গেল বিদ্যালয়ে হাতের লেখা শিখন কার্যক্রম শিশুকে হাতের লেখায় কুশলী করে তোলার চেয়েও অধিকতর তাৎপর্য এবং গুরুত্বপূর্ণ কারণ, এর ফলে সে আত্মপ্রকাশে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে উঠে। এটা কেবল একটা শিক্ষামূলক কৌশলমাত্র নয়—ব্যক্তিমনের সর্বাধিক প্রকাশ ঘটে এর মধ্যে দিয়ে। অপরের মনের আবেগ, বাসনা, মনোভাবের পরিচয় যেমন লেখার মধ্যে দিয়ে পাওয়া যায়, তেমনি লেখার মধ্যে দিয়েই শিশুমনের কল্পনা-আবেগ মুক্তির পথ পায়।

আধুনিক শিক্ষাপ্রণালী শিশুর মনস্তত্ব এবং সক্রিয়তাভিত্তিত বলে বিদ্যালয়ে হাতের লেখা শিখন কার্যক্রম সংগঠনের সময়ও এদিকে নজর দিতে হবে। বস্তুতঃপক্ষে আগেকার দিনে নিছক আদর্শ লিপি দেখিয়ে বা বর্ণের উপর দাগা বুলিয়ে শেখাবার যে পদ্ধতি প্রচলিত ছিল সেটা শিশুমনের কাছে আকর্ষণীয় মনে হত না। নিজেকে প্রকাশের স্বাভাবিক তাগিদের মধ্যেই লেখার ইচ্ছা আসে।

হাতের লেখা লিখন প্রস্তুতি কার্যক্রম ঃ

স্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন এবং যুক্তিসংগত দ্রুতগতিতে লেখার জন্যে শিশুর বয়স (maturity) সামর্থ্য, প্রকৃত আগ্রহ এবং প্রয়োজনকে কেন্দ্র করেই লিখন প্রস্তুতি কার্যক্রম রচনা করা দরকার। বলা বাহুল্য, শিশুর ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের কথাও স্মরণে রাখতে হবে। হাতের লেখার মধ্যে যে জটিল শারীরিক প্রক্রিয়া আছে, বাহু, হাত ও আঙ্গুলের ব্যবহার ও অবস্থানের এমন সব কৌশল আছে যেগুলি বিদ্যালয়ে আসা সাধারণ পরিবারে শিশুদের মধ্যে থাকে না। এ জন্যই প্রস্তুতি কার্যক্রম একান্ত আবশ্যক। হাতের লেখা শেখানো কার্যক্রমের প্রধান তিনটি স্তর—

ক) হাতের লেখার প্রস্তুতি

খ) লিখতে শেখা

গ) দক্ষ হাতের লেখার স্টাইল গড়ে তোলা

প্রস্তুতি কার্যক্রমের প্রধান উদ্দেশ্য হল শিশুর মধ্যে গভীর আগ্রহ সৃষ্টি করা এবং মোটামুটি সহজ লিখন কৌশল আয়ত্ত করা। এটা মোটামুটিভাবে পড়তে শেখার প্রাক্ পর্বেই হবে যাতে পরবর্তীকালে পঠনের সঙ্গে সঙ্গে শিশু লিখতে পারে।

বাড়ীতে শিশুরা খেলাধূলা এবং নানারকম কাজকর্মের সময় যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে সেটাকে

অবলম্বন করেই হাতের লেখা শেখার প্রস্তুতি কার্যক্রম হবে। শিশু যদি এমন বাড়ী থেকে আসে যেখানে পড়ালেখার পরিবেশ আছে তাহলে বিদ্যালয়ে আসার আগেই অনেকখানি প্রস্তুতি তার থাকার সম্ভাবনা। কিন্তু যে বাড়ীতে আদৌ লেখাপড়ার ব্যাপার নাই বা থাকলেও অমনোযোগী অভিভাবক, সেক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে হাতের লেখা শেখার প্রস্তুতি কার্যক্রম অত্যাবশ্যক। হাতের কাজ, ছবি আঁকা, মডেল তৈরীর পর্যাপ্ত সুযোগ বিদ্যালয়ে থাকা দরকার। একটা সামান্য রঙীন চক্ বা পেন্সিল দিলে শিশু ব্ল্যাকবোর্ডে বা মেঝেতে বা কাগজে আপন খুশিতে আঁকিবুকি করতে পারবে। আঙ্গুল দিয়ে শ্লেট বা বাতাসে লেখার ভঙ্গী শেখানো যেতে পারে। বালি বা কাঠ গুঁড়াতে শিশুরা আঙ্গুল দিয়ে লিখতে পারে। শস্যদানা দিয়েও তারা বর্ণ তৈরী করতে পারে। এটা তাদের কাছে খুব মজার মনে হবে। মন্তেসরি যেমনটি বলেছেন—কাঠ বা ধাতুর খাঁজকাটা বর্ণের ফাঁকে তুলি দিয়ে রঙ লাগাতে দিলেও শিশুদের হাত ঘোরানোর অভ্যাস তৈরী হবে। আজকাল তো কাঠের বা প্লাষ্টিকের তৈরী বর্ণও পাওয়া যায় যেগুলির সাহায্যেও শিশুদের লিখন প্রস্তুতি কার্যক্রম রচনা করা যায়। আঁকাবাঁকা, তেরা রেখার সম্বন্ধে ধারণা যাতে সৃষ্টি হয় সেদিকে সজাগ থাকতে হবে। আমাদের ছেলেবেলায় রামখড়ি (মোটা খড়ি) দিয়ে লেখার অভ্যাস করতে হত। বড়দের কাছে এছাড়াও আমরা শুনেছি—"লিখে দিনু কলাপাতে/শিখে নিবি আজই রাতে"।

পরবর্তী পর্যায়ে শিক্ষক মহাশয় ছাত্রের বেঞ্চে, বইতে বা অন্য কিছুতে তার নাম লিখতে বলতে পারেন। বিভিন্ন জিনিষে লেবেল লাগাতে বলতে পারেন। ব্ল্যাকবোর্ডে বারের নাম, দিনের কাজের তালিকা ইত্যাদি লিখতেও দেওয়া যায়। অসুস্থ সহপাঠীকে ছাত্ররা একটা চিঠি লিখতে চাইতে পারে। তাদের মুখে বলা কথাকে শিক্ষক মহাশয় লিখে ফেলতে পারেন—এতে শিশুরা দেখবে তাদের "ভাবনা"কেই লেখায় রূপ দেওয়া হয়েছে। বর্ণের দৃশ্যরূপ কিভাবে রচিত হয় সেটা তারা লক্ষ্য করবে। ফলে তারা প্রায় অজ্ঞাতসারেই শিখে ফেলবে বর্ণের আকার ও রূপ। যেসকল বর্ণের আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে (যেমন ব, র, ক, ধ, ঝ) সেগুলোও শিশু লক্ষ্য করবে।

হাতের লেখা শেখানোর পদ্ধতি ঃ

বলা বাহুল্য, প্রস্তুতি কার্যক্রমের মত এটাও শিশুর প্রয়োজন, অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত করেই রচিত হবে। তার কাছে অর্থবহ এমন কিছু অবলম্বন করেই লেখা শেখাতে হবে।

লেখার সাজ-সরঞ্জাম এবং হাতের অবস্থান সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে। পেন-পেন্সিল কখন কিভাবে ব্যবহৃত হবে এসব বিষয়ে নানান তর্ক-বিতর্ক চালু আছে। বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে বলা যায় যেসব সরঞ্জাম সহজে সংগ্রহ করা সম্ভব—যেগুলি দিয়ে মোটা লেখা যায়, যেগুলি শিশুরা সহজে ধরতে পারবে—এমন কিছুকেই লেখার জন্য বেছে নেওয়া যেতে পারে।

দেখাই যাচ্ছে শিশুকে এ-ধরণের শিখন-অভিজ্ঞতার সঙ্গে দক্ষ ও কুশলী শিক্ষক, বিদ্যালয় ও স্থানীয় পরিবেশের সুযোগ-সুবিধা এবং সামাজিক-অর্থ নৈতিক দিকগুলো ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত রয়েছে।

শিক্ষাক্রমের রূপায়ণ :

আমাদের শিশুদের শেখাটা যাতে এরকম সহজ স্বাভাবিক পরিবেশে হতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই শিক্ষাক্রম সংগঠিত হয়েছে। কিন্তু কোনো শিক্ষাক্রম যত নিখুঁতভাবেই তৈরী করা হোক না কেন, সেটি প্রয়োগ করে যতক্ষণ না উদ্দেশ্যসিদ্ধ হচ্ছে ততক্ষণ নানা রকম সন্দেহ, সংশয় বা তর্ক-বিতর্কের অবকাশ থেকে যায়।

সেজন্যে এবারের প্রাথমিক শিক্ষার নতুন শিক্ষাক্রম প্রণয়নের সময় এটির সুষ্ঠু রূপায়ণ ব্যবস্থার জন্য যে যে স্তরে ব্যবস্থা নিতে হবে সে-বিষয়ে শিক্ষাক্রম কমিটির প্রতিবেদনে কতকগুলি সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে। এসব নির্দেশের মধ্যে কয়েকটি শিক্ষক মহাশয়ের জন্য বিদ্যালয়ের কার্য পরিচালনা সংক্রান্ত, কয়েকটি রাজ্য সরকার তথা সরকারী সাংগঠিক ও প্রশাসনিক ব্যাপারে এবং বেশ কয়েকটি সম্মিলিত প্রয়াসে করবার জন্যে।

রাজ্য সরকার ও শিক্ষাক্রম রূপায়ণ :

শিক্ষাক্রমের যথাযথ সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্যে রাজ্য সরকারের যে অঙ্গীকার ও দায়দায়িত্ব তা' আন্তরিকভাবে যাতে রক্ষা করা যায় সে-বিষয়ে বর্তমান রাজ্য সরকার তথা শিক্ষা বিভাগ সচেতন আছেন। প্রশাসনিক, সাংগঠনিক, পরিদার্শনিক, পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন ও সরবরাহ, শিক্ষক শিক্ষণ প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাপারে যথাশীঘ্র সুব্যবস্থা করবার জন্য বিবিধ কার্যক্রম রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই নিয়েছেন। কিন্তু রাজ্য সরকার তাঁদের আর্থিক, প্রশাসনিক, সাংগঠনিক দায়দায়িত্ব যত সুষ্ঠুভাবেই পালন করুন না কেন "রাজ্য সরকারগুলির সীমাবদ্ধ আর্থিক সামর্থ্যের মধ্যে কেবলমাত্র অল্প সংখ্যক সমস্যারই সমাধান করা যায়।" (শ্রীপার্থ দে : শিক্ষামন্ত্রী : প্রাথমিক শিক্ষা সমাচার, জুন-জুলাই ১৯৮১)

শিক্ষক ও শিক্ষাক্রম :

যে কোনো শিক্ষাক্রমের সার্থক রূপায়ণে শিক্ষকের যে দায়দায়িত্ব ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তা আর কেউই নিতে পারেন না। বস্তুতঃপক্ষে শিক্ষাক্রমে যাই থাকুক না কেন তার কোনো তাৎপর্যই নাই যদি না শিক্ষক মহাশয় আন্তরিকভাবে সেটিকে কাজে লাগান। আর্থিক এবং অন্যান্য সহায়-সম্পদের ভূমিকা ও প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার না করেও বলা যায় শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে শিক্ষকের ভূমিকাই প্রধান। দীপ থেকেই দীপ প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে। শিক্ষার্থীর সুসংহত বিকাশে—বিকাশশীল সমাজের পটভূমিকায়—দক্ষ নিষ্ঠাবান শিক্ষকের একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু বিদ্যালয় এবং সমাজ-জীবনে শিক্ষক মহাশয় যাতে মর্যাদামণ্ডিত আসনে থেকে পারিপার্শ্বিক সকল সুযোগ-সুবিধার সদ্‌ব্যবহার করতে পারেন সেজন্যে সরকার ও সমাজের তরফেও কিছু করণীয় আছে। শিক্ষক মহাশয় যাতে স্বমহিমায় বিদ্যালয় পরিচালনা করতে পারেন সেজন্যে তাঁর বৃত্তিগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানা ধরণের শিক্ষক-কল্যাণ কর্মসূচীর জন্যেও রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই বিবিধ উদ্যোগ নিয়েছেন।

শিক্ষাক্রম রূপায়ণে গণ-উদ্যোগের সংযুক্তি :

শিক্ষাক্রম রূপায়ণে গণ-উদ্যোগের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। দেশে-বিদেশে, অতীত-বর্তমানে গণ-উদ্যোগেই শিক্ষার—বিশেষতঃ প্রাথমিক শিক্ষার—রথচক্র এগিয়ে চলেছে—এ তথ্য ইতিহাসের পাতায় রয়েছে। আমাদের দেশে ইংরাজপূর্ব আমলে বা ইংরাজ আমলেও এ দেশে সহস্র সহস্র দেশজ বিদ্যালয় ছিল যেগুলি দেশবাসী জনসাধারণের উদ্যোগ আয়োজনেই স্থাপিত এবং পরিচালিত হত।

স্বাধীনতা-পরবর্তী কালে দ্রুত শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে পৌছবার জন্যে যেসব পরিকল্পনা গৃহীত হয় তার সবগুলির সঙ্গেই জনসাধারণের যোগ রয়েছে। বস্তুতঃপক্ষে এদেশের বহু উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা-উদ্যোগ বেসরকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনাতেই স্থাপিত ও পরিচালিত। এগুলিতে সরকারী অনুদান সহযোগিতা থাকলেও এইসব প্রতিষ্ঠানের সুনামের মূলে রয়েছে জনগণের ঐকান্তিক আগ্রহ, সহযোগিতা ও প্রেরণা।

বিদ্যালয় যখন সমাজের মধ্যেই অবস্থিত, সমাজের প্রয়োজনেই যখন বিদ্যালয়-স্থাপনা তখন বিদ্যালয়ের উন্নয়ন এবং বিবিধ কর্মধারার সঙ্গে সমাজ আপন স্বার্থেই সহযোগিতা এবং যোগসূত্র রক্ষা করে চলবে। আর এরকম সহযোগিতা এবং পারস্পরিক নির্ভরতার মাধ্যমেই চাহিদাভিত্তিক এবং সমাজকেন্দ্রিক, বাস্তব এবং নমনীয় একটি শিক্ষাক্রম যথাযথ-ভাবে রূপায়িত হতে পারে।

বিদ্যা বিতরণ বা প্রদান শিক্ষক মহাশয়ের কাজ, ছাত্রছাত্রীর কাজ পুঁথি-শেখা, সমাজের লোকজনের কাজ বিদ্যালয় সম্পর্কে নির্লিপ্ত থাকা এমনটি নিশ্চয়ই কারুরই অভিপ্রেত নয়।

প্রকৃতপক্ষে একটি চিরস্থায়ী শিক্ষাক্রম বলে কিছু নাই—থাকতে পারে না। শিক্ষাক্রমকে যথেষ্ট পরিমাণে নমনীয় করেই গঠন করা হয়ে থাকে—যাতে স্থানীয় সামাজের চাহিদা, প্রয়োজন এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যথাসময়ে প্রয়োজন-মত সঙ্গতি স্থাপন করে বিদ্যালয়ের কর্মধারা নির্ণীত হতে পারে। শিক্ষাক্রম-উন্নয়নের প্রয়োজনেও তাই গণ-সংযুক্তির প্রয়োজন।

তাছাড়া রাজ্য সরকারের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা এবং শিক্ষার ব্যাপারে যাবতীয় দায়দায়িত্ব সরকারের এরকম ভাবনা যে স্বাভাবিক কারণেই কাম্য হতে পারে না—সেটি ইতিপূর্বেই কোঠারী কমিশনও যথাযথ গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করেছেন। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীপার্থ দে মহাশয়ও "আমাদের দেশে শিক্ষার জন্য সংগ্রহযোগ্য সীমাবদ্ধ সম্পদের মৌলিক অসুবিধা দূর করার জন্য গণ-উদ্যোগ" সবচেয়ে অভিপ্রেত বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

(পশ্চিমবঙ্গ—২৬ জুন ১৯৮১)

বিদ্যালয়ের উন্নয়নে গণ-সংযুক্তির ফলেই বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা বা নিঃসঙ্গতার যে ধারণা কোনো কোনো মহলে রয়েছে সেটিও সহজে দূরীভূত হতে পারে। যার সঙ্গে সকলের যোগ তাতে সংঘবদ্ধ প্রয়াসই শ্রেয়।

* * * *

প্রাথমিক শিক্ষার নতুন শিক্ষাক্রমের রূপায়ণ প্রসঙ্গে শিক্ষাক্রম প্রণেতাগণ বিদ্যালয়ে কতকগুলি "সহায়ক ব্যবস্থা" এবং "প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা" থাকা দরকার বলে উল্লেখ করেছেন। এইসব সহায়ক ব্যবস্থার মধ্যে—

(১) শিক্ষার্থীদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা

শিশু ব্ল্যাকবোর্ডে লেখার সময় কিভাবে দাঁড়াবে, বেঞ্চে বা মেঝেতে বসে লেখার সময় কিভাবে বসবে তা দেখিয়ে দিতে হবে। কাগজ কিভাবে থাকবে—কলমের কোথায় কিভাবে ধরতে হবে তাও শিশুকে দেখিয়ে দিতে হবে।

ছোট ছোট শিশুদের কাছে হস্তলিপির সুন্দর নিদর্শন দেখানো যেতে পারে—যা তারা অনুকরণ করে শিখতে পারবে। জড়ানো বা হেলানো লেখার পরিবর্তে সমকোণে উর্ধ্বমুখী লম্ব হলে মোটামুটি দেখতে ভাল হবে—শিশুদের পক্ষে লেখাও সহজ হবে। শিশুদের লেখা বর্ণ যাতে কোনটা মোটা/সরু, কোনটা লম্বা/ছোট ইত্যাদি না হয় সেদিকে নজর দিতে হবে। বাংলা অক্ষরের যে বিশেষ ধরণের গঠনভঙ্গী আছে সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। বিশেষতঃ বাংলা অক্ষরের মাত্রা অর্ধমাত্রা বা মাত্রা-হীনতার দিকে সজাগ করা দরকার। এ বিষয়ে সতর্ক না হলে পরবর্তীকালে শিশুদের লেখার গুরুতর অসংগতিও দেখা দিতে পারে।

যতই দিন যাবে শিশুর হাতের লেখায় দেখা দেবে সংগতি (uniformity) আসবে ধারাবাহিকতা (continuity), আসবে ছন্দ সুষমা (rhythm) তার অঙ্গুলির নাড়াচাড়া হয়ে উঠবে সহজ সাবলীল। প্রকৃতপক্ষে শিশুর হাতের লেখার গতি এবং গুণ (speed and quality) পরিমাপ করেই বলা যাবে লিপি লিখনে তার কুশলতা কতদূর অর্জিত হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিতে গণ-উদ্যোগের সংযুক্তি

প্রাক্ কথা :

আন্তর্জাতিক শিক্ষা উন্নয়ন কমিশন (১৯৭১-৭২) শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং তা রূপায়ণের উপায় বিশ্লেষণের সময় "সকলের জন্য প্রাথমিক শিক্ষায় সর্বাধিক গুরুত্ব" আরোপ করে বিশ্বব্যাপী একটি আন্তরিক উদাত্ত আহ্বান রেখেছিলেন।

এরও আগে ভারতের শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪-৬৬) সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতির ৪৫ ধারায় চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত সব শিশুর জন্য বিনা ব্যয়ে আবশ্যিক শিক্ষার ব্যবস্থা করার যে নির্দেশ ছিল তার লক্ষ্যে পরবর্তী দু দশকের মধ্যে পৌঁছবার জন্যে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেবার কথা বলেছিলেন।

আরও একটু পিছিয়ে গিয়ে দেখলে দেখা যাবে চল্লিশের দশকের সুবিখ্যাত সার্জেন্ট পরিকল্পনায় সব শিশুদের জন্য আট বছরের আবশ্যিক শিক্ষার-লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে সেখানে চল্লিশ বছর অর্থাৎ ১৯৪৪-৮৪ পর্যন্ত সময় সীমার কথা বলা হয়েছিল। আশাবাদী খের কমিটি এটাকে ষোল বছরে কমিয়ে এনে ১৯৬০ সালের মধ্যে এই লক্ষ্য অর্জন করতে চেয়েছিলেন।

লক্ষ্য বারবার দূরে সরে গেলেও লক্ষ্যচ্যুতি ঘটেনি। এখন পাঁচশালা পরিকল্পনায় অর্থাৎ ১৯৮৫ সালের মধ্যে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছতে ভারত কৃতসঙ্কল্প।

কিছু সংখ্যা—কিছু তথ্য :

প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত কিছু সংখ্যা তথ্যের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না—

(১) ভারতে বর্তমানে সাক্ষরতার হার হল ৩৬%।

(২) ভারতের মোট ৫৭৫,৯২৬ গ্রামের মধ্যে প্রায় ৪৮,৫৬৬ গ্রামে কোনো বিদ্যালয় নাই।

(উৎস : ইউনিসিয়েফ—১৯৭৯)

(৩) ভারতে ৬—১১ বছর বয়সী (১ম—৫ম শ্রেণী) ছেলেমেয়েদের ৮৩·৪ ভাগ, ১১—১৪ বছর বয়সী শিশুদের (৬ষ্ঠ—৮ম শ্রেণী) ৩৮·৪ ভাগ এবং ১৪ থেকে ১৭ বছর বয়সীদের ২১ শতাংশ বিদ্যালয়ে যায়।

(উৎস : ইউনিসিয়েফ—১৯৭৯)

(২) মধ্যাহ্নকালীন আহার

(৩) শিশু-কল্যাণ কর্মসূচী এবং

(৪) বিদ্যালয়গৃহ নির্মাণ, সংস্কার, আসবাব ও ন্যূনতম শিক্ষোপকরণের ব্যবস্থা রয়েছে।

প্রত্যেক বিদ্যালয়ে যেসব প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা থাকা দরকার সেগুলির মধ্যে—

(১) একটি বিদ্যালয়গৃহ

(২) অত্যাবশ্যকীয় শিক্ষা উপকরণ

(৩) পানীয় জল ও শৌচাগার

(৪) বসবার আসন

(৫) বিভিন্ন কাজের জন্য পৌনঃপুনিক অর্থেক প্রয়োজনভিত্তিক অনুদান এবং

(৬) উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ অন্যতম।

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির বাস্তব অবস্থা :

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেসব প্রয়োজনীয় এবং সহায়ক ব্যবস্থা ও সুবিধা থাকার কথা সেগুলির পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন সমীক্ষাদিতে প্রাপ্ত কিছু তথ্যের উল্লেখ করা যেতে পারে।

(ক) এক দশক আগে ১৯৬৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে "পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং তার শিক্ষক" শিরোনামে একটি সমীক্ষা পরিচালিত হয়েছিল। এই সমীক্ষাতে প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে যেসব বিষয় জানা যায় তার কয়েকটি হল—

(ক) গ্রামাঞ্চলের ২৫ ভাগ বিদ্যালয়ের একটির বেশী ঘর নাই।

(খ) পায়খানা, প্রস্রাবাগার অধিকাংশ বিদ্যালয়েই নাই।

(গ) পানীয় জলের সুব্যবস্থাও নাই।

(ঘ) দশভাগ গ্রামীণ বিদ্যালয়ে ১ জন করে শিক্ষক এবং গ্রামাঞ্চলে বিদ্যালয়পিছু গড়ে তিনজন শিক্ষক আছেন।

(খ) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিক্ষা সংস্থা থেকেও জাতীয় শিক্ষা গবেষণা প্রশিক্ষণ সংস্থার সহযোগিতায় বিগত বৎসরে বিভিন্ন জেলার প্রায় একশ প্রাথমিক বিদ্যালয় সম্পর্কে তথ্যাদি সংগৃহীত হয়েছিল। ঐসকল বিদ্যালয়ের প্রদত্ত তথ্যাদি থেকেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যাদির অনুরূপ বিষয় জানা যায়।

(গ) অতি সম্প্রতি প্রাথমিক শিক্ষার নতুন শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও রূপায়ণের ব্যাপারে বিদ্যালয়ের বাস্তব-অসুবিধা ও সমস্যাদি সম্পর্কে জানবার জন্য চব্বিশ পরগণার হাবড়া-অশোকনগর-বারাসাত এলাকার প্রায় তিন শতাধিক প্রধান/সহ শিক্ষক-শিক্ষিকার সঙ্গে রাজ্য শিক্ষা সংস্থা একাধিক আলোচনাচক্রে মিলিত হয়েছিলেন। এই সকল আলোচনাচক্র-গুলিতেও শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ তাঁদের বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা এবং সমস্যাদির ব্যাপারে যে চিত্র তুলে ধরেন তাও উল্লিখিত তথ্যাদির থেকে খুব একটা ভিন্ন ধরণের নয়।

(ঘ) চতুর্থ সর্বভারতীয় শিক্ষা সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য থেকেও জানা যাচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গৃহ সমস্যা রীতিমত উদ্বেগজনক। ৪০ ভাগ বিদ্যালয়েরই ভাল বিদ্যালয়গৃহ নাই। শুধু এজন্যই দরকার ৫০০ কোটি টাকার। অন্যান্য উপকরণেরও খুবই অভাব আছে। ১৯৮১ সালের ২রা জুন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীদের সভায় তাই বিদ্যালয়গৃহ, শিক্ষা-উপকরণ প্রভৃতির সমস্যা সমাধানের জন্য জনগণকে আরও বেশী এগিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে।

অন্য পথ নাই ঃ

বেদবাণী উচ্চারণ করে বলা যায় "নান্য পন্থা বিদ্যতে…" সকলের জন্য শিক্ষার লক্ষ্যে দ্রুত পৌঁছবার জন্যে সকলের উদ্যোগ এবং সহযোগিতা ভিন্ন অন্য কোনো বাস্তব উপায় নাই। রাজ্য সরকার তাঁদের অঙ্গীকার দায়-দায়িত্ব পালন করুন, শিক্ষক মহাশয় তাঁর বৃত্তিকে ব্রত করে তুলুন—এরকম অভিপ্রায়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি বিদ্যালয়ের পারিপার্শ্বিক সমাজেরও তাঁদের বিদ্যালয়কে সব দিক থেকেই সেরা করে তোলার, শিখন-পরিবেশের উপযোগী করে তোলার একটি স্ব-আরোপিত শপথের কথাও বিস্মৃত হলে চলবে না।

গণ-উদ্যোগের ক্ষেত্র ঃ

(ক) প্রাথমিক শিক্ষার নতুন শিক্ষাক্রমে প্রধান যে চারটি এলাকা রয়েছে :—

(ক) স্বাস্থ্য শরীরচর্চা ও খেলাধূলা

(খ) উৎপাদনশীল ও সৃজনশীল কাজ

(গ) প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজ এবং

(ঘ) পঠন-পাঠন নির্ভর কাজ

তার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই বিদ্যালয় ও গণ-সংযোগের প্রয়োজন আছে। এইসব কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, বিশেষজ্ঞ, বাস্তব অভিজ্ঞতা ও ব্যবহারিক জ্ঞানের জন্য জনগণের সহযোগিতা ও সাহায্য প্রয়োজন হবে। বিশেষতঃ যে সকল বিষয়-অভিজ্ঞতা সরাসরি পুস্তক নির্ভর নয় সেগুলির কার্যক্রমের নানা স্তরে গণ-উদ্যোগের সংযুক্তি আবশ্যক।

(খ) শিক্ষাক্রমে বিদ্যালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় যে সব ব্যবস্থা থাকা দরকার বলে উল্লেখ করা হয়েছে, বিভিন্ন সমীক্ষা, আলোচনা চক্র থেকে বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে যে সব তথ্যাদি পাওয়া গেছে, দেশের আর্থিক সঙ্গতির যে চিত্র পাওয়া যাচ্ছে সে সবের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে অবিলম্বে গণ-উদ্যোগ আবশ্যক :—

(১) যে সব বিদ্যালয়ের গৃহ জীর্ণ বা ভগ্ন সেগুলির সংস্কার বা পুনরায় নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ, শ্রম, কাঁচামাল সংগ্রহে উদ্যোগী হওয়া দরকার।

(২) বিদ্যালয়ের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় কিছু আসবাব ও শিক্ষা-উপকরণ যেমন—ব্ল্যাকবোর্ড, বিভিন্ন ধরণের মানচিত্র, চেয়ার, টেবিল, বসবার আসন, ছোট আলমারী বা ট্রাঙ্ক, কিছু খেলার সরঞ্জাম ইত্যাদির জন্য ও গণ-উদ্যোগ হলে বিদ্যালয়ের প্রভূত উপকার হবে।

(৩) কেবল বাড়ীতে নয়, বিদ্যালয়েও শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য কিছু কল্যাণমূলক কার্যক্রম থাকা দরকার। যেমন স্থানীয় চিকিৎসক দিয়ে শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা বা স্বাস্থ্য অভ্যাস সম্পর্কে তথ্যাদি জ্ঞাপন প্রভৃতির জন্যও ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। বিশুদ্ধ পানীয় জল সংরক্ষণ এবং পায়খানা প্রস্রাবাগার প্রভৃতির ব্যবস্থাও করা দরকার। স্থানীয় জনসাধারণের আনুকূল্যে এ সব সমস্যার অনেকখানিই সমাধান করা সম্ভব।

(৪) আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীদের একটা বড় অংশ না খেয়ে বা আধপেটা খেয়ে আসে। লেখাপড়ায় মন বসাতে হলে পেটভরা শাস্তিও প্রয়োজন একথা সবাই মানেন। এ সমস্যার গুরুত্ব এবং যথাশীঘ্র এর সমাধানের জন্য রাজ্য সরকার বিশেষভাবে সচেতন আছেন এবং প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিচ্ছেন। কিন্তু রাজ্য করকারের সীমিত ভাণ্ডারের কথাও ভাবতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬১ লক্ষেরও বেশী ছেলেমেয়ে পড়ছে। এদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশী প্রায় ৩৫ লক্ষ শিক্ষার্থী এখন দুপুর বেলায় খাবার পাচ্ছে। এ জন্যে এ বছরে রাজ্য সরকারের ৬ কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। অর্থাৎ পড়ুয়া পিছু (প্যাকিং ও পরিবহন খরচ সহ) এক টাকা কুড়ি পয়সা খরচ ধরা হয়েছে। চব্বিশ পরগণা জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাড়ে তিন লাখ শিক্ষার্থী এ সুযোগ পেলেও একটা বিরাট অংশ তা পাচ্ছে না। যত দিন সরকারী পর্যায়ে কোনো ব্যবস্থা না হচ্ছে অন্ততঃ তত দিনের জন্য স্থানীয় জনসাধারণ আন্তরিক প্রয়াসের দ্বারা এ সমস্যার আংশিক সমাধানেও সহায়তা করতে পারেন।

(৫) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অত্যাবশ্যকীয় কিছু কিছু উপকরণ আসবাবপত্রাদির জন্য গণ-উদ্যোগ নিলে বিদ্যালয়ে শিক্ষা-পরিবেশ রচনায় খুবই সহায়তা হবে এ-বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। স্থানীয় জনসাধারণ অর্থ বা বস্তু দিয়ে এ সমস্যার অনেকখানি সমাধানে সক্ষম।

(৬) আরও একটি দিকে গণ-চেতনা বৃদ্ধির জন্য গণ-উদ্যোগ একান্ত আবশ্যক। শিক্ষার প্রতি অনেক পিতামাতার যে ঔদাসিন্য আছে সেটি দূর করবার জন্য যেমন উদ্যোগী হতে হবে, তেমনি যে শিশুরা বিদ্যালয়ে আসছে তারা যাতে মাঝপথে বিদ্যালয় ছেড়ে না যায় এবং নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসে সেদিকেও সজাগ থাকা দরকার। শুধু তাই নয় বিদ্যালয়ে সরাসরি পঠন-পাঠন নির্ভর নয় এমন অনেক কাজ স্বাস্থ্য শারীর শিক্ষা, হাতের কাজ, সৃজনাত্মক কাজ প্রভৃতি হবে যেগুলি সম্পর্কেও অভিভাবকদের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে হবে, যাতে শিক্ষক মহাশয় যথার্থ অর্থে শিক্ষাক্রম অনুসরণ করতে কোনোদিক থেকে বাধার সম্মুখীন না হন।

প্রেরণাসঞ্চারী দৃষ্টান্ত ঃ

প্রশ্ন উঠতে পারে বিদ্যালয়ের উন্নয়নে গণ-উদ্যোগের প্রেরণাসঞ্চারী দৃষ্টান্ত আজকের দিনে কোথাও লক্ষ্য করা গেছে কি ? ভারতের অন্যান্য রাজ্যেই বা এ ব্যাপারে কী হচ্ছে ? এর উত্তর বলা যায় ভারতের বেশ কয়েকটি রাজ্যে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্যে পৌছানোর জন্যে, স্থানীয় বিদ্যালয়ের অভাব অসুবিধা দূর করে সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য সরকারী উদ্যোগের বাইরে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ গণ-উদ্যোগের কার্যক্রম অনুসৃত হচ্ছে। এ সবের ফলাফলও বেশ আশাব্যঞ্জক।

কাশ্মীর, মহীশূর, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, রাজস্থান প্রভৃতি রাজ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অভাব-অসুবিধা দূরীকরণে গণ-উদ্যোগের বিভিন্ন কার্যক্রম লক্ষ্য করা গেছে। তামিলনাড়ু ও মহারাষ্ট্রের উদ্যোগ এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। তামিলনাড়ুতে ৪২৫টিরও বেশী "স্কুল ইম্প্রুভ্মেন্ট কনফারেন্স" হয়েছে যার ফলশ্রুতি স্বরূপ ১২ কোটি টাকারও বেশী সম্পদ অর্থ বা জিনিষপত্রে সংগৃহীত হয়েছে। বলা বাহুল্য মাত্র এ ধরণের কাজে সরকারী পর্যায়ে উৎসাহ দেখানো হলেও সম্পূর্ণ ব্যাপারটি বেসরকারী পর্যায়ে সংগঠিত হয়ে থাকে। স্থানীয় জনসাধারণকে বিদ্যালয়ের অসুবিধা জানালে জনসাধারণই বিদ্যালয়ের সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ নেন।

মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলার কাছাকাছি ৮/১০ বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রতি সপ্তাহের শনিবার এবং রবিবার যে কোনো একটি বিদ্যালয়ে সপ্তাহান্তিক শিবিরে মিলিত হন। ঐ দুদিনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, আলোচনা চক্রে গ্রামের জনগণ, সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক সকলেই অংশ নেন। বিদ্যালয়ের সমস্যা-প্রয়োজন ইত্যাদি প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এরপরই গ্রামবাসীগণ বিদ্যালয়ের অসুবিধা দূরীকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি নেবার চেষ্টা করেন। মহারাষ্ট্রের এ ধরণের সাপ্তাহিক শিবির বিদ্যালয়ের উন্নয়নে বেশ উৎসাহের সঞ্চার করেছে।

পশ্চিমবঙ্গেও গণ-উদ্যোগের দৃষ্টান্ত বিরল নয়। বিদ্যালয়গৃহ সংস্কার বা নির্মাণে গ্রামীণ জনগনের অংশ গ্রহণ উল্লেখ্যভাবে বাড়ছে বলেই স্বয়ং মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীপার্থ দে মহাশয় উল্লেখ করেছেন। সরকারী অনুদান অপেক্ষা পঞ্চায়েতের নেতৃত্বে অনেক বেশী সম্পদ বিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য সংগৃহীত হবার কথাও তিনি বলেছেন। অর্থ উপকরণ শ্রম দিয়ে স্থানীয় জনসাধারণ বিদ্যালয়ের সাহায্যে এগিয়ে আসছেন।

কলানবগ্রামের কথা ঃ

বর্ধমান জেলার কলানবগ্রাম মিশ্র অধিবাসী অধ্যুষিত একটি সাধারন জনপদ। পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক তথা বুনিয়াদী শিক্ষার জগতে সুপরিচিত আচার্য বিজয়কুমার ভট্টাচার্য এখানে যে কয়টি শিক্ষা সংস্থার প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত তারই একটি হল নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়টির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এটি সকাল থেকে শুরু করে বিকেল পর্যন্ত চলে যদিও এটি আবাসিক নয়। আশে পাশের গ্রাম থেকেই অধিকাংশ ছেলেমেয়ে এবং শিক্ষকরা আসেন। এখানে ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যাহ্ন আহারের একটি অভিনব ব্যবস্থা লক্ষ্য করা গেছে। স্থানীয় আশে পাশের গ্রামের মানুষরা বাড়ীতে ঐ বিদ্যালয়ের শিশুদের জন্য প্রতিদিন কিছু পরিমাণ চাল সংরক্ষিত পাত্রে তুলে রাখেন। বিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকগণ মাসের কোন এক সময়ে তা সংগ্রহ করে আনেন। বিদ্যালয় সংলগ্ন বাগানে কিছু সবজী চাষের ব্যবস্থাও আছে। এরকম একটি উদ্যোগ বিবিধ অসুবিধার মধ্যেও অনেক আগের থেকেই সেখানে চলে আসছে।

পুরুলিয়ার গ্রামে ঃ

পুরুলিয়া জেলার মাঝিহীরা শাল-সেগুনে বেষ্টিত একটি ছোট্ট গ্রাম। সেখানে সহজ শিক্ষা উপকরণ তৈরীর একটি আকর্ষণীয় দৃষ্টান্ত দেখা গিয়েছে। বয়স্ক শিক্ষার জন্য ব্ল্যাকবোর্ড সংগ্রহ করতে না পেরে ঘরের দেয়ালে গোবর আর লতাপাতার রসের মিশ্রণে তাঁরা এক ধরণের দেওয়ালবোর্ড তৈরী করে নেন—এতে ব্ল্যাকবোর্ডের কাজ চলে যায়।

মেদিনীপুর জেলায় ঃ

দক্ষিণ কাশিমনগর গ্রামে প্রায় শত বর্ষের এক প্রাচীন প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। গ্রামবাসীগণের ইচ্ছা ও উদ্যোগে বিদ্যালয়গৃহের আয়তন বৃদ্ধির জন্য এক চেষ্টা সফল হয়েছে। খড়ের চালের এই বিদ্যালয়গৃহ মেরামতির খরচ-খরচা গ্রামবাসীগণই সংগ্রহ করে থাকেন।

শ্রীনগর কলোনী—হাবড়া ঃ

চব্বিশ পরগণা জেলার হাবড়া এলাকার অতীতের পূর্ববঙ্গ থেকে আগত মানুষজন জীবন সংগ্রামে সদাব্যস্ত। এখানেরই একটি কলোনী শ্রীনগরের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের আনুকূল্যে পাকা বিদ্যালয়গৃহ

নির্মাণের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। হীরাপুল গ্রামের অধিবাসীগণও বিদ্যালয়গৃহ পুনঃনির্মাণে বিশেষ উদ্যোগী হয়েছেন।

বলা বাহুল্যমাত্র এরকম গণ-উদ্যোগের দৃষ্টান্ত অসংখ্য রয়েছে—আমরা হয়ত সেগুলির খবর জানতে পারছি না। কিছু একটা বিশ্বাস করবার মত যথেষ্ট কারণ আছে বর্তমান পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ বেসরকারী উদ্যোগে "বিদ্যালয় উন্নয়ন কর্মসূচী" সংগঠনের মাধ্যমে প্রাথমিক নতুন শিক্ষাক্রমটি যাতে বিদ্যালয়ে সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত হতে পারে সেজন্য আন্তরিক প্রয়াস চালানো অবাস্তব হবে না।

বিদ্যালয় উন্নয়ন কর্মসূচী সংগঠন ঃ

প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় যাতে শিক্ষা-পরিবেশের দিক থেকে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে, শিক্ষার প্রতি পিতামাতার ঔদাসিন্য যাতে চলে যায়, ছেলেমেয়েরা যাতে মাঝপথে না বিদ্যালয় ছেড়ে যায়, বিদ্যালয়ের গৃহ সংস্কার বা নির্মাণে, শিক্ষা-উপকরণ সংগ্রহে, স্বাস্থ্যসূচী অনুসরণের মত ব্যাপারগুলিতে অবিলম্বে স্থানীয়, অঞ্চল বা ব্লক পর্যায়ের বিভিন্ন স্তরের জনপ্রতিনিধি, শিক্ষানুরাগী, পৌরপ্রধান প্রভৃতিদের নিয়ে "বিদ্যালয় উন্নয়ন সংস্থা" গড়া যেতে পারে। প্রয়োজন মনে করলে স্থানীয়ভাবে নিযুক্ত সরকারী শিক্ষা বিভাগের লোকজনদেরও এই সংস্থায় রাখা যেতে পারে।

* * * *

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিক্ষা সংস্থা এ রাজ্যের সকল স্তরের বিদ্যালয় শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের জন্য বিবিধ কর্মসূচী নিয়েছেন। বিকাশশীল সমাজ ও শিশুর চাহিদাভিত্তিক নয়া শিক্ষাক্রমটি বিদ্যালয়ে যথাযথ অনুসরণের ক্ষেত্রে বিশেষতঃ প্রাথমিক শিক্ষার সর্বাঙ্গীণ উন্নতিতে গণ-উদ্যোগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বিবেচনা করে এ বিষয়ে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করছেন।

যেসব বই পত্র-পত্রিকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে :

(১) Report of the Education Commission : 1964-66

(২) 25 Years of Independence : Education.

(৩) Curriculum in Transaction.

(৪) Educational Innovations in India : Some Experiments.

(৫) Asian Institute of Educational Planning and Administration : School Improvement Projects ane Community Support.

(৬) E P A. Bulletin Vol. 4, No. 2

(৭) Journal of Indian Education Vol. IV, No. 6

(৮) Curriculum Bulletin. Vol. 1, No. 3

(৯) Report of the Fourth All India Educational Survey.

(১০) ভূমিলক্ষ্মী, ৯ জুন ১৯৮১

(১১) যুবমানস, মে ১৯৮১

(১২) পশ্চিমবঙ্গ, ২৬ জুন ১৯৮১

(১৩) পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা সমাচার, জুন-জুলাই ১৯৮১

(১৪) প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম, পশ্চিমবঙ্গ।

রচনা :
শ্রীআলোক মাইতি

সহায়তা :
শ্রীনিতাইচন্দ্র দত্ত
শ্রীমতী কৃষ্ণা বসু
শ্রীমহম্মদ রেফাতুল্লা

ছড়ায় বর্ণ

শ্রীপ্রভাতকুমার দাস

১.

ব	বক উড়ছে সাদা পাখা
র	রথ চলেছে হাজার চাকা।
ক	কলম দিয়ে লেখেন দাদা
ধ	ধনুক হাতে দিচ্ছে বাধা।
ঝ	ঝড় উঠেছে বিকাল বেলা
ঘ	ঘরের বাইরে বন্ধ খেলা।

২.

ক	কলম নিয়ে লিখতে বস
খ	খাতার পাতায় অংক কষ।
গ	গরু চরায় রাখাল মাঠে
ঘ	ঘোড়ার গাড়ী চলছে হাটে।
চ	চাঁদ দেখা যায় পাতার ফাঁকে
ছ	ছাতার নীচে ছায়া থাকে।
জ	জলের উপর শালুক ফোঁটে
ঝ	ঝড়ের আগে নৌকা ছোটে।

---

* শিশুদের পঠন পস্তুতি কার্যক্রমে এরকম ছড়া ব্যবহার করা যেতে পারে। উৎসাহী শিক্ষক বন্ধুগণ এরকম লেখা রাজ্য শিক্ষা সংস্থায় পাঠাতে পারেন।

সংস্থা-সংবাদ

স্বাগত-বিদায় :

শ্রীযুক্ত নিঃশঙ্ক ঘোষ ১৯৮১ সালের প্রথম পর্বে রাজ্য শিক্ষা সংস্থার ভারপ্রাপ্ত উপাধ্যক্ষরূপে যোগদান করেন। প্রতিষ্ঠানের নানা ক্ষেত্রে তাঁর প্রেরণাসঞ্চারী প্রভাব যখন গভীরভাবে অনুভূত হচ্ছিল তখনই বছরের শেষ মাসে এই সংস্থা থেকে এল তাঁর বিদায়-লগ্ন। তাঁর বিদায় রাজ্য শিক্ষা সংস্থার কাছে একই সঙ্গে বেদনা ও আনন্দের। বেদনা এই জন্যে যে—প্রতিদিনের কাজে এখানের কর্মিগণ তাঁর সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হল। আর আনন্দের এই কারণে যে সংস্থা থেকে তাঁর বর্তমান কর্মক্ষেত্র দূরান্তরে নয়। শুধু তাই নয়, এ রাজ্যের শিক্ষা ক্ষেত্রে অন্যতম প্রতিষ্ঠান স্নাতকোত্তর বুনিয়াদী শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় (বাণীপুর)-এর অধ্যক্ষরূপে তাঁর নিয়োগ পরম প্রীতিকর।

* * * *

১৯৮১ সালের শেষ মাসে দীর্ঘ সাড়ে সাত বছর পরে রাজ্য শিক্ষা সংস্থার ষষ্ঠ অধ্যক্ষরূপে শ্রীযুক্ত কমলকুমার চট্টোপাধ্যায় কার্যভার গ্রহণ করেছেন। সংস্থা তাঁকে আন্তরিক স্বাগত জানাচ্ছেন।

* * * *

১৯৮১ সালের শেষপর্বে ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপক শ্রীমহম্মদ রেফাতুল্লা রাজ্য শিক্ষা সংস্থায় বদলী হয়ে এসেছেন, সংস্থা তাঁকেও স্বাগত জানাচ্ছেন।

অন্যান্য খবর :

রাজ্য শিক্ষা সংস্থার অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর শ্রীনিতাইচন্দ্র দত্ত বিগত কয়েক মাসে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠিত পপুলেশন এডুকেশন, টিচার এডুকেশন, কেপ প্রজেক্ট, এডুকেশন্যাল সার্ভে প্রভৃতি সেমিনার-ওয়ার্কশপে রাজ্যের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেছেন।

* * * *

প্রাথমিক শিক্ষার নয়া শিক্ষাক্রমের পটভূমিকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষণের জন্য যে নতুন শিক্ষাক্রম প্রস্তুতির পথে সেজন্যে রাজ্য শিক্ষা সংস্থার প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত উপাধ্যক্ষ শ্রীনিঃশঙ্ক ঘোষ, বর্তমান অধ্যক্ষ শ্রীকমলকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডঃ সরোজ চট্টোপাধ্যায় বিভিন্নস্তরে গুরুত্ব-পূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

রাজ্য শিক্ষা সংস্থা

পশ্চিমবঙ্গ

—কর্মীবৃন্দ—

১।	সর্বশ্রী কমলকুমার চট্টোপাধ্যায়	: অধ্যক্ষ
২।	নিতাইচন্দ্র দত্ত	: অ্যাসিস্ট্যাণ্ট প্রফেসর
৩।	ডঃ সরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়	: "
৪।	অশোককুমার ভট্টাচার্য	: "
৫।	মহম্মদ রেফাতুল্লা	: "
৬।	শ্রীমতী কৃষ্ণা বসু	: রিসার্চ অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট
৭।	সর্বশ্রী নিমাইদাস দত্ত	: "
৮।	সুধাংশুশেখর সেনাপতি	: সিনিয়র রিসার্চ অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট
৯।	আলোক মাইতি	: "

* * *

১০।	সর্বশ্রী শিবেন্দ্রকিশোর চক্রবর্তী	: হেড অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট
১১।	চঞ্চল গঙ্গোপাধ্যায়	: অফিস অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট
১২।	আইডনচন্দ্র পাল	: "
১৩।	তুষারকান্তি ঘোষ	: "
১৪।	বিনয়রঞ্জন চক্রবর্তী	: "
১৫।	অমূল্য রায়	: ড্রাইভার

* * *

১৬। সর্বশ্রী নারায়ণচন্দ্র চক্রবর্তী
১৭। ভবতোষ আচার্য
১৮। বীরেনকুমার পাল
১৯। নকুলচন্দ্র দাস
২০। রাখালচন্দ্র বৈদ্য
২১। পরিতোষ আচার্য
২২। রুদ্র বাহাদুর
২৩। গণেশ রাউত
২৪। রামপদ সরকার
২৫। বুন্দী রাজবংশী

"গুরু-কথা"

"মানুষ মানুষের কাছ হইতেই শিখিতে পারে; যেমন জলের দ্বারাই জলাশয় পূর্ণ হয়, শিখার দ্বারাই শিখা জ্বলিয়া উঠে, প্রাণের দ্বারাই প্রাণ সঞ্চারিত হইয়া থাকে। মানুষকে ছাঁটিয়া ফেলিলেই সে তখন আর মানুষ থাকে না, সে তখন আপিস-আদালতের বা কল-কারখানার প্রয়োজনীয় সামগ্রী হইয়া উঠে; তখনি সে মানুষ না হইয়া মাস্টার-মশায় হইতে চায়; তখনি সে আর প্রাণ দিতে পারে না, কেবল পাঠ দিয়া যায়। গুরু-শিষ্যের পরিপূর্ণ আত্মীয়তার সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই শিক্ষাকার্য সজীব দেহের শোণিত-স্রোতের মতো চলাচল করিতে পারে।.........আমাদের সমাজব্যবস্থায় আমরা সেই গুরুকে খুঁজিতেছি যিনি আমাদের জীবনকে গতিদান করিবেন; আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় আমরা সেই গুরুকে খুঁজিতেছি যিনি আমাদের চিত্তের গতিপথকে বাধামুক্ত করিবেন। যেমন করিয়া হউক, সকল দিকেই আমরা মানুষকে চাই; তাহার পরিবর্তে প্রণালীর বটিকা গিলাইয়া কোনো কবিরাজ আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন না।"

—রবীন্দ্রনাথ